পৃথিবীর সেরা রূপকথা

হিমাংশু জোশী



পৃথিবীর সেরা রূপকথা

হিমাংশু জোশী

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ (September, 1985)

আশ্বিন, ১৯০৭ (Asvina, 1907)

Vishwa Ki Sreshth Lok Kathaen (Bengali)

(বাংলা অনুবাদ ঃ মায়া গুপ্ত)

মূল্যঃ ১০ টাকা

Price : Rs. 10.00

সহ-সম্পাদক ঃ মনোজ গুপ্ত

অলংকরণ ঃ সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ প্রকাশন বিভাগ ঃ

- এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
- সুপার বাজার (সেকেন্ড ফ্লোর), কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী - ১১০০০১
- কমার্স হাউস, করিমভয় রোড, ব্যালার্ড পায়ার, বোম্বাই-৪০০০৩৮
- এল· এল· অডিটোরিয়াম, ৭৩৬ আন্না সলাই, মাদ্রাজ - ৬০০০০২
- প্রেস রোড, ত্রিবান্দ্রম-৬৯৫০০১
- বিহার ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক বিল্ডিং, অশোক রাজপথ, পাটনা-৮০০০০৪
- ১০-বি ষ্টেশন রোড, লক্ষ্মৌ-২২৬০০১
- স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম বিল্ডিং, পাবলিক গার্ডেন, হায়দ্রাবাদ-৫০০ ০০৪

ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার, পাতিয়ালা হাউস, নতুন দিল্লী-১১০০০১ কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুখ্য প্রবন্ধক, কেন্দ্রীয় সরকারী মুদ্রণালয় (প্রকাশন বিভাগ) সাঁত্রাগাছি, হাওড়া দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সারা বিশ্ব একটি পরিবারের মতই। সেইজন্য দেশবিদেশের গল্পকথার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের লোকজীবনের সঙ্গে আমাদের দেশের শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। এভাবে প্রথম থেকেই শিশু ও কিশোরদের মনে বহির্বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা বোধ জন্মাবে। 'পৃথিবীর সেরা রূপকথা' বইখানি সেই দিক থেকে এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

হিমাংশু জোশী হিন্দী সাহিত্যে একটি পরিচিত নাম। তিনি একজন শক্তিশালী গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। গত আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে আমাদের বিশেষ গ্রন্থমালার অঙ্গ হিসেবে ছোটদের জন্য হিন্দীতে এই বইখানি তিনি লিখেছিলেন। এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো।

—ডাঃ শ্যাম সিং শশি
ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ

জওহরলাল নেহরু রূপকথার প্রসঙ্গে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিলেন—"আমি কতবার আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি যে সব নারী ও পুরুষ এমন সজীব গল্পকথার কল্পনা করেছিলেন, তাঁরা কেমন ছিলেন, আর কোন্ সোনার খনি থেকে এই সব কাহিনী চয়ন করে এনেছিলেন।"

যে কোনো দেশের লোককথা সেখানকার জনজীবনের কল্পনা ও আদর্শের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এ কথা তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই সব কাহিনী সেসব দেশের লোকজীবনের এক অমূল্য ও অক্ষয় সম্পদ।

লোককথা বা রূপকথা ছেলেমেয়েদের মনই শুধু ভোলায় না, তাদের অনেক কিছু জানতেও সাহায্য করে। এই বইটির রচনাশৈলী যেমন সুন্দর তেমনি এর ভাষা সরল ও সজীব, শিশুদের উপযোগী।

এই বইটি ভারত সহ তেরোটি দেশের তেরোটি রূপকথার সঙ্কলন। দেশগুলি হল ঃ ভূটান, তিব্বত, ইরান, মাঞ্চুরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, নরওয়ে, সোভিয়েত রাশিয়া, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া, জাপান, জাম্বিয়া, আমেরিকা এবং ভারত।

যে উদ্দেশ্যে বইখানি প্রকাশিত হল আশা করা যায় তা সফল হবে। ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশের রূপকথাসংগ্রহ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে।

সম্পাদক



সর্পগন্ধার সেতু

ভূটান

হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। একসময় আদিত্য নামে এক ভাস্কর ছিলেন। লোকে বলত সারা দুনিয়ায় এমন শিল্পী নাকি আর জন্মায়নি। আদিত্যের হাতের তৈরি পাথরের মূর্তিগুলি যেন কথা বলত।

আদিত্য মানুষটির আত্মসম্মানবোধ ছিল অতি প্রখর। কখনও কারো কাছে মাথা নত করতেন না। তাই অতি কষ্টে তাঁর দিন কাটতো। বলতেন শিল্পীর হাতই পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী হাত। শিল্পীর হাত কখনও হার মানে না।

মৃত্যুর সময় আদিত্যের ঘরে একটি পয়সাও ছিল না। ছোট ছোট দুটি ছেলে মেয়েকে কেমন করে মানুষ করবেন এই চিন্তায় আকুল হয়ে আদিত্যের স্ত্রী যখন কাঁদতে লাগলেন তখন আদিত্য তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—সুসন্তানের চেয়ে বড় ধন দৌলত জগতে আর কিছু নেই। ছেলে মেয়ে যদি ভাল হয়, গুণের হয়, তাহলে তোমার আর কোন কষ্ট থাকবে না। গুরুর আশ্রমে পাঠিয়ে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিও, শিক্ষা শেষ হলে আশে পাশের দেশগুলি ভ্রমণ করতে পাঠিয়ে দিও। এইভাবে তারা বড় হয়ে সবরকম জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

শিল্পীর মৃত্যু হল। আদিত্যের স্ত্রী ছেলে আর মেয়েকে স্বামীর উপদেশ মত গুরুর আশ্রমে পাঠিয়ে তাদের ভালোভাবে শিক্ষিত করে তুললেন। তারপর গুরুর কাছে পড়াশুনা শেষ হলে তাদের দেশ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলেন।

কর্মকেতু আর মঞ্জুমায়া দুই ভাই বোন মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরুলো।

তিন চার মাস ধরে ভ্রমণের পর তারা পোঁছল প্রভামেরু রাজ্যের সীমানায়। সেখান থেকে গেল রঙ্গপুরম নামে একটি খুব সুন্দর নগরে। সেই নগরের সমস্ত বাড়ি-ঘর ছিল উজ্জ্বল শ্বেতপাথরের তৈরি। নগরের ঠিক মাঝখানে পাথরের একটা স্তম্ভের উপর ছিল এমন একটা চকচকে উজ্জ্বল পাথর যে সেই পাথর থেকে দিনরাত নক্ষত্রের মত চিকমিক আলো ছড়িয়ে পড়ত। নগরে জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট দীঘি ছিল আর সেগুলির চারধারে নানা রঙের ফুলের গাছ দিয়ে সাজান বাগান ছিল। সেই সব বাগানে হরেক রকম সরস মিষ্টি ফলের গাছও ছিল।

নগরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সর্পগন্ধা নদী। নদীর জল গভীর চকচকে কালো! লোকে নদী পারাপার করতে ভয় পেত।

কর্মকেতু আর মঞ্জুমায়া নগরে পোঁছুল। দেখল সর্পগন্ধার তীরে অসংখ্য লোকের ভীড়। কিছু লোক বস্তাভর্তি খাদ্যশস্য, কেউ কেউবা শুকনো মেওয়া কিসমিস বাদাম ভর্তি বড় বড় থলি আর কেউবা মধুভরা কলসী নিয়ে একত্র হয়েছে। কিছু সদাগর রেশমি কাপড়ের বড় বড় গাঁট নদী তীরে বালুর ওপর রেখে নৌকার জন্য অপেক্ষা করছে। আবার অনেকে নদীর ওপারে মন্দিরে পূজো দিতে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে এধার ওধার ছুটোছুটি করছে।

নদী পারাপার করাবার জন্য নৌকা মাত্র একটি আর যাত্রী অপেক্ষা করছে অসংখ্য। নৌকাটি তীরে ঠেকা মাত্র তাতে ওঠবার জন্য হুটোপাটি পড়ে গেল। চিলের মত লোকেরা ঝাপটা ঝাপটি শুরু করে দিল নৌকায় একটু জায়গার জন্য।

কর্মকেতু এক বুড়ো যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করল—নদী পার হতে আপনাদের তো এত ঝঞ্ঝাট এত কষ্ট, তাহলে আপনারা নদীর উপর সেতু তৈরি করান না কেন?

নিরুপায় যাত্রী কর্মকেতুর দিকে তাকিয়ে বলল,

সাতশ বছর ধরে মানুষ করে নদী পার
নদীর উপর পুল বাঁধতে কষ্ট হল সার।
এমন মানুষ কোথায় আছে
বাঁধবে এতে পুল?
চওড়া বিশাল নদী এ যে
পায় না মানুষ কুল।
কে আছে যে বাঁধবে সেতু?
কষ্ট মোদের চিরটা কাল
মন্দ কপাল হেতু।

কর্মকেতু আর মঞ্জুমায়া বুড়োর দুঃখের ছড়া শুনে খুবই দুঃখিত হল। ভাই বোনে ঠিক করল যে নদীর ওপর তারা নিজেরাই সেতু তৈরি করবে।

তাদের এই সঙ্কল্পের কথা শুনে রঙ্গপুরম নগরের লোকেদের মহা আনন্দ। ভাস্কর আদিত্যের শিক্ষা নৈপুণ্যের গল্প তারা আগেই অনেক শুনেছিল। কর্মকেতু আর মঞ্জুমায়া ভাস্করের ছেলে মেয়ে শুনে তাদের মনে যত ভরসা ততই আনন্দ। সকলের মুখে কর্মকেতুরই গুণের কথা।

এই দেখে বোন মঞ্জুমায়ার মনে একটু হিংসা হল। সকলেই তার ভাই-এর গুণগান করছে অথচ তার গুণের কথা তো কেউই বলছে না। তাই সে ঠিক করল, সে নিজেও একটা সেতু তৈরি করবে, আর এমন সেতু তৈরি করবে যা কর্মকেতুর তৈরি সেতুর চেয়ে যে কেবল বেশী মজবুত হবে তাই নয় সেটি হবে আরও সুন্দর।

এবার ভাই-বোনের মধ্যে ঠিক হল—এক রাতের মধ্যে সেতু তৈরি করতে হবে। যারটা আগে হবে তারই জয়। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়। যার পুল পুরো তৈরি হবে না বা যার পুল সুন্দর হবে না তাকে অপরের কাছে হার মানতে হবে।

মঞ্জুমায়া ঠিক করল সর্পগন্ধার পশ্চিম দিকে সেতু তৈরি করবে। সেতুর জন্য সে দ্রুত পাথর কাঠ ইত্যাদি আনাবার ব্যবস্থা করে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে দিল। রাত যখন কেবল অর্ধেক হয়েছে তার মধ্যেই মঞ্জুমায়ার সেতু প্রায় তৈরি হয়ে গেল।

সেতুটি এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে তা দেখে মঞ্জুমায়ার আনন্দ আর ধরে না। সে এবার গেল নগরের দক্ষিণ দিকে ভাই-এর সেতু কেমন হচ্ছে তাই দেখবার জন্য।

গিয়ে তো অবাক। কোথাও কিছু নেই। না আছে সেতুর নাম-গন্ধ আর না দেখা গেল ভাইকে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ পড়ল পাহাড়ের ঢালের দিকে। মনে হল অনেক সাদা ভেড়া যেন নেমে আসছে। চাঁদের আলোয় সেই সাদা ভেড়াগুলিকে মঞ্জুমায়া আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে দেখল। সে সেই ভেড়ার পালের দিকে দেখতে লাগল। ভেড়ার দল আরও কাছে আসতে এবার সে অবাক হয়ে দেখল, এগুলো মোটেই সাদা ভেড়ার পাল নয়। শ্বেত পাথরের টুকরো, দূর থেকে সাদা ভেড়ার মত দেখাচ্ছিল। মঞ্জুমায়া দেখল কর্মকেতু সেতু তৈরি করবার জন্য পাহাড় থেকে সাদা পাথর বয়ে নিয়ে আসছে। তার সঙ্গে অনেক লোকও পাথর আনছে। পাথরগুলি চাঁদের আলোয় বড় বড় হীরের টুকরোর মত দেখাচ্ছিল। ঝিকমিক করছিল পাথরগুলো। মঞ্জুমায়া বেশ বুঝতে পারল, এই পাথরে তৈরী সেতু কত সুন্দর আর মজবুত হবে।

মঞ্জুমায়ার বড় চিন্তা হল।

সে এবার চটপট নিজের তৈরী সেতুর কাছে এসে সেতুটিকে আরও সুন্দর করবার জন্য কাজ আরম্ভ করে দিল। এবার সে সেতুর পাথরগুলির উপর সুন্দর সুন্দর নক্সা খোদাই করতে লাগল, নানা রকমের রঙবেরঙের ফুল বসালো পাথরের ওপর যাতে কর্মকেতুর সেতুর চেয়ে তার সেতু দেখতে সুন্দর হয়। আর দেখতে দেখতে সেই সেতুর রূপ খুলে গেল। সমস্ত সেতুটিই নানা রকমের সুন্দর সুন্দর কারুকার্যে ভরে গেল।

নক্সা খোদাইয়ের কাজ শেষ করে সে নিজের তৈরী সেতুটিকে আবার ভাল করে দেখতে লাগল। সত্যিই সেটি কত সুন্দর দেখাচ্ছিল! মঞ্জুমায়ার যেন বিশ্বাস হয় না যে তার নিজের হাতে তৈরী হয়েছে এই সেতু।

সেতুর কাজ শেষ করে মঞ্জুমায়া আবার গেল ভাইএর সেতু দেখতে। কর্মকেতুর সেতুটিও খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। প্রায় তৈরী, কেবল দুটো খিলানের উপর শ্বেত পাথর বসান বাকি আছে। আর সবই তৈরী।

ভাইএর এই সুন্দর সেতুটি দেখে মঞ্জুমায়ার মাথায় এক দুষ্ট অভিসন্ধি এল। সে নিজে মুরগীর ডাকের নকলে আওয়াজ দিল আর তাই শুনে ভোর হয়েছে ভেবে নগরের যত মুরগী ডাক দিতে লাগল।

ফলে যা হবার তাই হল। ভোরবেলায় মুরগীগুলো ডাক দিচ্ছে এবার সময় শেষ হয়েছে ভেবে কর্মকেতু খুব তাড়াতাড়ি যেমন তেমন করে পাথর দুটি থামের উপর লাগিয়ে দিল। এভাবে ভোর হতে না হতে তার সেতু তৈরীর কাজ শেষ করে ফেলল।

ভোর হল। রঙ্গপুরম নগরের লোকেরা সর্প-গন্ধার উপর এমন সুন্দর দুটো সেতু দেখে অবাক হয়ে গেল। কর্মকেতুর সেতুটি খুব চওড়া আর বেশ মজবুত। সে সেতুর নাম হল বড় পাথরের সেতু। মঞ্জুমায়ার তৈরী সেতুটি ছিল ছোট ছোট পাথরে তৈরী, তাই তার নাম হল 'ছোট পাথরের সেতু'। ছোট পাথরের সেতুর পাথরের উপর সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম দেখে নগরের মেয়েরা কাপড়ে সেই নক্সা তুলতে আরম্ভ করে দিল।

সারা রাজ্য সেতু দুটির প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। কর্মকেতু আর মঞ্জুমায়ার জয়জয়কার। আর এই সব দেখে দুষ্ট দৈত্য মকুরের মনে খুব রাগ আর হিংসা হল। মকুরের একটা বড় দোষ ছিল সে কারও সুখ্যাতি শুনতে পারত না। হিংসায় মরে যেত। তাই সে ঠিক করল, 'বড় পাথরের সেতুটাকে কোন রকমে ভেঙ্গে ফেলতে হবে'।

3 MIB/83

এই ঠিক করে মকুর দানব এক ব্যবসায়ীর বেশ ধরে ঘোড়ায় চড়ে শহরে এল। ঘোড়ার পিঠে দুদিকে দুটো খুব বড় বড় খালি বস্তা ঝুলিয়ে নিল। একটা বস্তার মধ্যে ভরল চাঁদ আর একটা বস্তার মধ্যে ভরল সূর্যকে।

খুব ভারি হল বস্তা দুটো, কিন্তু তবু তার মন ভরল না। এবার সে ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে দিল খুব বড় এক ঠেলা গাড়ি, আর সেই ঠেলা গাড়িতে চাপাল অনেকগুলি সোনা আর রুপোর তক্তা। সেই ঠেলা গাড়িটা ঠেলবার জন্য মকুর তার আর এক বন্ধু অরাগ দৈত্যকে নিযুক্ত করল।

এই ভাবে ভীষণ ভারি বোঝা নিয়ে মকুর আর অরাগ দৈত্য বড় পাথরের সেতু ভাঙ্গতে চলল।

সেতুটার কাছে পৌঁছে মকুর চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল এমন সেতু কে তৈরী করেছে? এটা একেবারেই মজবুত নয়।

কর্মকেতু মকুর দানবের কথা শুনে তার সামনে এসে রুখে দাঁড়াল।

মকুর তাকে জিজ্ঞাসা করল—আমরা এ সেতুর উপর চড়ে নদী পার হলে সেতুটা ভেঙ্গে পড়বে না তো?

কর্মকেতু বুড়ো ব্যবসায়ীর কথা শুনে জোরে হেসে উঠল, হাঃ হাঃ হাঃ—একটা ঘোড়া আর একটা ঠেলাগাড়ির ওজনে সেতু ভেঙ্গে পড়বে?—কর্মকেতু আবার হাসতে লাগল।

তারপর বলল—কত লোক তো এখনই এই সেতুর উপর দিয়ে নদী পার হয়ে গেল। সেতুর কিছুই তো হয়নি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে সেতুর উপর দিয়ে চলে যান আপনার ঘোড়া আর ঠেলা নিয়ে। এ সেতু ভাঙ্গবে, এমন হাতের তৈরি সেতু এ নয়।

দুই দৈত্যই মাথা হেলিয়ে কর্মকেতুর কথা মেনে নিল।

ছবঙ্গ

তিব্বত

অনেক কাল আগেকার কাহিনী। এক ছিল রাজা। সেই রাজা একবার রাগ করে তার রাণীকে রাজমহল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারপর রাণীকে এক পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে এসেছিল।

সেখানে রাণীর এক ছেলে হল। শিশুটি ছিল যেমন সুন্দর, তেমনি লম্বা চওড়া আর স্বাস্থ্যবান। তার মুখ আর গলা ছিল লাল টুকটুকে, তাই রাণী আদর করে নাম রাখল ছবঙ্গ।

ছবঙ্গ ছিল একটু আশ্চর্য ধরনের শিশু। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সে কথা বলতে শুরু করল। পনেরো দিনের মধ্যে সেই শিশু বেড়ে উঠল যেন



এক বছরের ছেলেটি। আর অতি অল্প বয়সে সে এক নিপুণ তীরন্দাজ হয়ে উঠল।

সে অনেক দূরে দূরে শিকার করতে যেত। একদিন সে ঠিক করল সিংহ শিকার করবে, আর সত্যি সত্যি সিংহ শিকার করে নিয়ে এল সন্ধ্যাবেলা।

ছেলের এই রকম শক্তি আর সাহস দেখে মায়ের মনে আনন্দ আর ধরে না।

সে রাতে ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করল—মা, আমার বাবা কোথায়?

মা তখন তাকে জীবনের সমস্ত কাহিনী শোনাল।

মা-এর কাছে সব শুনে ছবঙ্গ রাজার ছেলে বলে মনে মনে যেমন খুশী হল তেমনি আশ্চর্যও। কিন্তু রাণী হয়েও তার মায়ের এই রকম গরীব অবস্থার কথা ভেবে কষ্টও কম হল না।

ঘোড়ায় চড়ে বুড়ো ব্যবসায়ীর বেশে মকুর আর ঠেলা গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে অরাগ সেতুর উপর দিয়ে যাত্রা সুরু করল।

একটু দূরে এগিয়ে যেতেই, তাদের সেই ভারি বোঝার ওজনে সেতুটা কাঁপতে লাগল। এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ে বড় পাথরের সেতু।

তাই দেখে কর্মকেতু ঘাবড়ে গেল। আর তখনই তার মনে পড়ল তার বাবা আদিত্য ভাস্করের কথাটি। তিনি বলতেন—শিল্পীর হাত পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী হাত—সে হাতের কখনও হার হয় না।

কথাটি মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মকেতু সেতুটির নীচে গিয়ে দু'হাতে সেতুটিকে ধরে রইল।

আর তখন দেখতে দেখতে মকুর আর অরাগ দানব নিজেদের সেই অমানুষিক বোঝা নিয়ে সেতু পার হয়ে গেল। সেতু ভেঙ্গে পড়ল না।

মকুরের চেষ্টা ব্যর্থ হল, সে হেরে গিয়ে বন্ধুকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

আজও রঙ্গপুরমের কাছে সর্পগন্ধা নদীর সেই সেতু হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেতুটির উপর এখনও আছে মকুর দানবের ঘোড়ার খুরের দাগ আর সেতুর তলার দিকে একটি মানুষের দু'হাতের চিহ্ন।

তার কাছেই পাহাড়ের গায়ে লেখা আছে "শিল্পীর হাত পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী হাত, সে হাতের কখনও হার হয় না।"

ছবঙ্গ সব শুনে বলল—মা, আমি আমার বাবার কাছে যাব আর এই সিংহের চামড়াটা তাঁকে উপহার দেব।

মা তাকে বুঝিয়ে বলল—বাছা, তোমার বাবা বড়ই রাগী মানুষ, হঠাৎ রেগে গিয়ে তিনি আবার কিছু করে ফেলতে পারেন। তাছাড়া তোমার মত বনবাসী, শিক্ষা দীক্ষা হীন ছেলেকে তিনি রাজপুত্র বলে মানবেন না হয়তো। তার চেয়ে তুমি রাজার কাছে যাবার সংকল্প ছেড়েই দাও।

—তুমি কোন চিন্তা করোনা মা, আমি সব সামলে নেব।

এই বলে মাকে বুঝিয়ে ছবঙ্গ রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাত্রা করল। সঙ্গে নিল সিংহের সেই চামড়াখানা।

মাসের পর মাস ধরে অনেক পাহাড় অনেক নদী পার হয়ে অবশেষে ছবঙ্গ একদিন তার বাবার রাজ্যে পৌঁছাল।

মন্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে?

—আমার নাম ছবঙ্গ। আমি একজন শিকারী, আমি রাজাকে সিংহের এই চামড়াটি উপহার দিতে চাই।

মন্ত্রীর কাছে তার কথা শুনে রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। এমন বাহাদুর ছেলে এর আগে রাজা আর কখনও দেখেন নি। ছবঙ্গের লাল টুকটুকে চেহারা আর সিংহের চামড়া দেখে রাজা অবাক।

—তুমি এই সিংহটাকে মেরেছ? —রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ছবঙ্গ বলল—হাঁ মহারাজ, আমি আমার শিকার করা সিংহের চামড়াখানা আপনাকে উপহার দিতে চাই। তাই এখানে এসেছি। আর এই সঙ্গে ভাবলাম বাবার সঙ্গেও আমার দেখা হয়ে যাবে। আপনি কি আমার বাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবেন মহারাজ?

—নিশ্চয় দেখা করিয়ে দিতে পারব, কিন্তু তিনি কোথায়?

রাজার দিকে দেখিয়ে ছবঙ্গ বলল—এই যে, আমার সামনেই বসে আছেন আমার বাবা। এই বলে সে তাঁকে মায়ের কাহিনী শোনাল।

রাজা এ কাহিনী শুনে অবাক হলেন, ভাবলেন, এ ছেলে বলে কি? সে তাঁর ছেলে? আমি এই জঙ্গলি ছেলেটার বাবা। রাজার মনে হল ছেলেটা মিথ্যা কথা বলছে। খুব চালাক ছেলে, আমার রাজ্যের লোভে মিথ্যা করে আমার ছেলে সেজে এসেছে। একে বিদায় করে দেওয়াই ঠিক।

রাজা এক চাল চাললেন। ছবঙ্গকে বললেন—তোমার মত বাহাদুর শিকারী ছেলে পাওয়া তো ভাগ্য, ভগবানের দয়ায় আমি তোমায় পেলাম। কিন্তু তোমায় আমার নিজের ছেলে বলে স্বীকার করে নেবার আগে আমি তোমায় পরীক্ষা করতে চাই। তুমি আর একটা সিংহ মেরে নিয়ে এস।

রাজার ফন্দি ছবঙ্গ টের পেল না, সে বেশ খুশী হয়ে তখনই আর একটি সিংহ শিকার করতে রওনা হল।

কত বড় বড় গভীর জঙ্গলই না ছবঙ্গ সিংহ শিকারের জন্য তোলপাড় করল। কিন্তু সিংহের দেখা কোথাও মিলল না।

অবশেষে একদিন হঠাৎ পথে দেখা হল এক বুড়োর সঙ্গে। ছবঙ্গ তাকে প্রণাম করল।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করল—কোথায় চলেছ বাবা?

—আমি সিংহ খুঁজতে বার হয়েছি, কিন্তু কোথাও পাচ্ছিনা। কোথায় গেলে সিংহ পাব আমায় বলতে পারেন কি?

বৃদ্ধ তার কথা শুনে ছবঙ্গের আপাদ-মস্তক দেখল। তারপর বলল—বাঃ তুমি তো বেশ

ছেলে দেখছি। আচ্ছা এক কাজ কর, তুমি সামনের এই পথ ধরে চলতে থাক। কিছুদূর গেলে লামাদের একটা মঠ দেখতে পাবে। দোর খুলে মঠের মধ্যে ঢুকে যাবে। সেখানে এক লামাকে দেখতে পাবে, তোমাকে দেখেই লামা তোমায় খুব মারতে আরম্ভ করবে। তার হাতে মার খেয়ে তুমি ধৈর্য হারিও না, শান্ত হয়ে লামার মার সহ্য করবে। পরে সেই লামাই তোমায় সিংহের সন্ধান বলে দেবে।

বুড়োর কথামত ছবঙ্গ সামনের পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে চওড়া রাস্তা শেষ হল, এবার সে মানুষের পায়ে হাঁটা সরু পথে গিয়ে পড়ল। তারপর রাস্তাটা আরও সরু হয়ে এল, আর তারপর সে সেই লামার মঠ দেখতে পেল। ছবঙ্গ সেই মঠের দরজায় গিয়ে চিৎকার করতে লাগল—কে আছ দোর খুলে দাও।

ভেতর থেকে সাদা দাড়িওলা এক লামা বের হয়ে এল আর কথা বার্তা না বলে ছবঙ্গকে ধরে মারতে আরম্ভ করে দিল।

ছবঙ্গ আর কি করে। চুপ করে লামার হাতের মার খেতে লাগল, বুড়োর কথা তার মনে ছিল। বেশ খানিকক্ষণ ধরে ছবঙ্গকে পিটিয়ে এবার লামা তাকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে? এখানে এসেছ কেন?

ছবঙ্গ লামাকে সব খুলে বলল।

শুনে লামা এবার খুব হাসতে লাগল, বলল—সিংহ মারতে চাও? তুমি তো খুব সাহসী ছেলে দেখছি। বেশ, তবে শোন—সামনের এই পথ ধরে চলতে থাক, খানিকটা গিয়ে দেখবে সামনে এক বিশাল চন্দন গাছ। সেই গাছের তলা দিয়ে একটা সিংহ রোজ জল খেতে যায়। তুমি গাছের উপর চড়ে লুকিয়ে বসে থাকবে। প্রথমে জল খেতে আসবে পাখিরা. পাখিদের পরে আসবে অন্য জন্তু জানোয়ারেরা, আর সবার শেষে আসবে সেই সিংহ। সিংহ যেই গাছের তলায় আসবে তখনই তুমি লাফ দিয়ে সিংহের পিঠে চড়ে বসবে। তারপর সিংহের কান খুব জোরে টেনে ধরে চন্দনের ছড়ি দিয়ে তাকে মারতে থাকবে। তারপর সিংহ মাথা হেলাবে, এর মানে তুমি যা বলবে সিংহ তাই করবে, সে তোমার বশ মানবে। তারপর থেকে যখনই তুমি চন্দনের ছড়িটা ঘোরাবে তখনই সেই সিংহ তোমার সামনে হাজির হবে।

ছবঙ্গ আবার সামনের পথ ধরে চলতে লাগল। বেশ কদিন হাঁটার পর তবে সে সেই চন্দন গাছ দেখতে পেল। চন্দন গাছে চড়ে ছবঙ্গ তার একটা সরু ডাল ভেঙ্গে ছড়ি তৈরি করে চুপচাপ বসে রইল সিংহের আশায়।

আর সত্যিই খানিক পরে সিংহ এল। সে যেমনি চন্দন গাছের তলায় পেঁাছেছে, সঙ্গে সঙ্গে ছবঙ্গ এক লাফে তার পিঠে চড়ে বসল। তারপর চন্দনের ছড়িটা দিয়ে সিংহকে মারতে লাগল তার কান টেনে ধরে। যতক্ষণ না সিংহ মাথা হেলিয়ে ছবঙ্গের বশে এল, ততক্ষণ সে তাকে মারতেই লাগল। অবশেষে সিংহ মাথা হেলিয়ে বুঝিয়ে দিল সে ছবঙ্গের বশ হয়েছে।

খুব খুশী হয়ে ছবঙ্গ ফিরে এল তার বাবার রাজ্যে। মহলে এসে রাজাকে বলল—আমি আপনার শর্ত মত কাজ করেছি।

রাজার বিশ্বাস হলনা, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি সিংহ মেরে এনেছ?

—সিংহকে মেরে আনিনি, আমি জীবন্ত সিংহ পোষ মানিয়ে নিয়ে এসেছি।

একথা শুনে রাজার চোখ তো কপালে উঠল—কি বলছ তুমি? জীবন্ত সিংহকে তুমি পোষ মানিয়ে এনেছ?

—হাঁ মহারাজ।

—কোথায় সেই সিংহ?

ছবঙ্গ চন্দনের ছড়িটা ঘোরাল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর সিংহ সামনে এসে হাজির।

রাজার দরবারের লোকেরা ভয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে বাঁচল। রাজা নিজেও ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। চিৎকার করে বললেন—সিংহটাকে তাড়াও—তাড়াও, আমি তোমায় রাজপুত্র বলে স্বীকার করছি। তোমার মাকে রাণী বলে মেনে নিলাম।

এবার সিংহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু রাজা লোক ভাল নয়, এত সহজে হার মানবার পাত্র তো তিনি নন। তাই এবার ভেবে চিন্তে আর এক নতুন চাল চাললেন। ছবঙ্গকে বললেন—তুমি আমার খুবই উপযুক্ত ছেলে। তোমার জন্যে তোমার যোগ্য এক অতি সুন্দরী বৌও তো চাই। শুনেছি সিফু দানবের মেয়ে নাকি পৃথিবীতে সব-চেয়ে রূপসী। তোমায় তাকে বিয়ে করে আনতে হবে। পারবে তো?

—কেন পারবো না। আপনি যেমন আদেশ দেবেন আমি তাই করবো।

—তাহলে এখনই রওনা হও আর সেই সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করে নিয়ে এস।

ছবঙ্গ একটুও দেরি না করে সিফু দৈত্যের খোঁজে যাত্রা করল। অনেক দিন অনেক মাস ধরে সে দুর্গম পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালো। কিন্তু সিফু দানবের প্রাসাদ আর কোথাও খুঁজে পেল না।

চলতে চলতে শেষে এবার সমুদ্রের ধারে পৌঁছুল। সেখানে গিয়ে দেখল এক অবাক কান্ড। এক মস্ত লম্বা মেয়ে বিরাট এক চামচে করে সমানে সমুদ্রের জল খেয়েই যাচ্ছে। দেখতে দেখতে মেয়েটা সমুদ্রের অর্ধেক জল খেয়ে নিল।

ছবঙ্গ তাকে বলল—তুমি তো ভারি অদ্ভুত মেয়ে, অর্ধেকেরই বেশী সমুদ্রের জল তুমি খেয়ে ফেলতে পারলে?

—আমি আর কি এমন কাজ করেছি? শুনেছি পৃথিবীতে একজন লোক আছে যে সিংহকে পোষ মানাতে পারে। তার তুলনায় আমি তো কিছুই নই।

ছবঙ্গ বলল,—তুমি যার কথা বলছ আমিই সেই লোক। আমিই সিংহকে পোষ মানিয়েছি।

মেয়েটি হি-হি করে হেসে উঠে বলল—তুমি?

—হ্যাঁ আমি। দেখাব তোমায় আমার সেই সিংহকে?

মেয়েটি ঠাট্টা করে বলল—দেখাও।

ছবঙ্গ চন্দনের ছড়ি হাওয়ায় ঘোরাতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা ধুলোর ঝড়ের মত হলো। সেই হাওয়ায় সিংহের গর্জন শোনা গেল, আর সিংহ সামনে হাজির হল।

জ্যান্ত সিংহ সামনে দেখে মেয়েটি তো ভয়ে কাঁপতে লাগল। হাতজোড় করে ছবঙ্গকে বলল—এটাকে শিগ্গির সরিয়ে নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। আমি চিরকাল তোমার কেনা দাসী হয়ে থাকব।

ছবঙ্গ হাসতে লাগল। বলল—তাহলে সিফু দানবের বাড়ি কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও।

মেয়েটি তাকে সঙ্গে নিয়ে গেল এক অদ্ভুত পাহাড়ের উপর। সেখানে গিয়ে দেখল এক বিরাট চেহারার লোক একটা বিশাল পাহাড় দু'হাতের উপর তুলে নিয়ে আসছিল।

ছবঙ্গ আশ্চর্য হয়ে তাকে বলল—তুমি তো অদ্ভুত শক্তিশালী লোক।

—আমি আর কি শক্তিশালী—পৃথিবীতে এমন একজন আছে, যে জঙ্গলের হিংস্র সিংহকে পোষ মানাতে পারে। তার তুলনায় আমি কিছুই নই।

—আমিই সেই লোক যে সিংহকে পোষ মানায়, ছবঙ্গ বলল।

খুব ভাল করে ছবঙ্গের আপাদমস্তক দেখে লোকটা বলল—তুমি?

তাকে অবিশ্বাস করতে দেখে ছবঙ্গ তার চন্দনের ছাড়টা হাওয়ায় ঘোরাল আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহটা গর্জন করতে করতে সেখানে হাজির হল।

ভয়ে চিৎকার করে লোকটা ছবঙ্গকে বলল—সিংহকে সরিয়ে নাও, আমি চিরকাল তোমার কেনা দাস হয়ে থাকব।

তারপর তারা তিন জনে মিলে সিফু দানবের প্রাসাদ খুঁজতে রওনা হল। চলতে চলতে একটা চওড়া নদী এল। যখন তারা নদী পার হচ্ছে তখন দেখল একটা লোক এক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ছবঙ্গ তাকে জিজ্ঞাসা করল—কি দেখছ তুমি?

লোকটি বলল—আমি পাঁচ মাস আগে আকাশে একটা তীর ছুঁড়েছিলাম এখনও সে তীর মাটিতে এসে পড়েনি, তাই দেখছি।

—ভাই, তুমি তো আশ্চর্য কুশলী মানুষ—ছবঙ্গ তাকে বলল।

—আমি আর এমন কি আশ্চর্য কুশলী। আমি শুনেছি এ জগতে সত্যিকার কুশলী এক মানুষ আছে যে বনের সিংহকে বশ করতে পারে।

ছবঙ্গ বলল—আমিই সেই লোক।

যাও যাও বাজে বকো না। কেটে পড় এখান থেকে। তুমি সিংহ চোখে দেখেছ কখনও?

কিছু না বলে ছবঙ্গ তার চন্দনের ছাড়টা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে সিংহ তার সামনে এসে হাজির হল।

লোকটা খুব ভয় পেয়ে বলল—ভাই, সিংহের কবল থেকে বাঁচাও আমাকে। সারা জীবন আমি তোমার গোলামি করব।

এবার এই তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে ছবঙ্গ সিফু দৈত্যের মহলের খোঁজে যাত্রা করল আবার। অনেক দিন এই রকম করে কেটে গেল। কত পথ যে হাটল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

অবশেষে একদিন দৈত্যপুরী সত্যিই দেখা গেল। তখন রাত হয়ে এসেছে। তারা তিনজন ক্লান্ত হয়ে দৈত্যের প্রাসাদের কাছেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।
কিন্তু ছবঙ্গের চোখে ঘুম নেই। সে দৈত্যপুরীর মধ্যে ঢোকবার উপায় চিন্তা করতে লাগল।

আর সেই সময় শুনতে পেল মাথার ওপরে দুই পাখির কথাবার্তা।

তারা বলছিল—ভোর বেলা যখন রাজকুমারী স্নান করতে আসে তখন তাকে কি সুন্দর যে দেখায়—

অন্য পাখিটা বলল—এত মেয়ের ভিড়ের মধ্যে রাজকুমারীকে তুমি চিনলে কেমন করে?

—কেন, তাকে চেনা আর শক্ত কি যত ভিড়ই হোক রাজকুমারীকে ঠিক চেনা যায়, তাছাড়া তার কপালে ওঁ চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়—প্রথম পাখিটা বলল।

ভোর হতেই ছবঙ্গ স্নানে যাবার সময় রাজকুমারীকে চিনতে পারল আর তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাবার রাজ্যের দিকে রওনা হল।

এবার রাজাকে হার মানতে হল ছবঙ্গের সাহস ও বীরত্বের কাছে। তাকে নিজের ছেলে বলে রাজা স্বীকার করলেন। ঘোষণা করে দিলেন ছবঙ্গ রাজার উত্তরাধিকারী আর তার মাকে রাণীর সম্মান দিয়ে রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন।



ফেরিওলা জ্যোতিষী

ইরান

এক সময় এক ফেরিওলা ছিল। সে ছিল গরীব। সারা দিনের পরিশ্রমে কোন রকমে তার আর তার বউয়ের দুবেলা খাবার জুটত।

একদিন ফেরিওলার বৌ নগরের সাধারণ স্নানাগারে স্নান করতে গিয়েছিল। স্নান করবার সময় সে কিছু গোলমাল শুনতে পেল। স্নানঘরের দেখাশোনা ও পরিষ্কার করবার জন্য যে মেয়েটি ছিল সে খুব ব্যস্তভাবে অন্য সব স্নানার্থী মেয়েদের তাড়াতাড়ি করে চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছিল।

ফেরিওলার বৌও স্নান শেষ না করেই বাইরে বেরিয়ে এল।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল— কি হয়েছে?

কর্মচারী মেয়েটি বলল—রাজার প্রধান জ্যোতিষীর স্ত্রী এখনই স্নান করতে আসবেন, তাই স্নানঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তোমরা এটা খালি করে দাও।

ফেরিওলার বৌ-এর রাগ হল ভাল করে স্নান করতে না পেরে। সে বাড়ী ফিরে এল। রাতে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বলল—তুমি জ্যোতিষী হতে পার না কেন? তাহলে আমার আর এই সব অসুবিধা সহ্য করতে হয় না। সমাজে মান ইজ্জত বাড়ে।

—আরে, আমি তো এক ফেরিওলা, আমি জ্যোতিষী হব কেমন করে? জ্যোতির্বিদ্যা তো আমার জানা নেই।

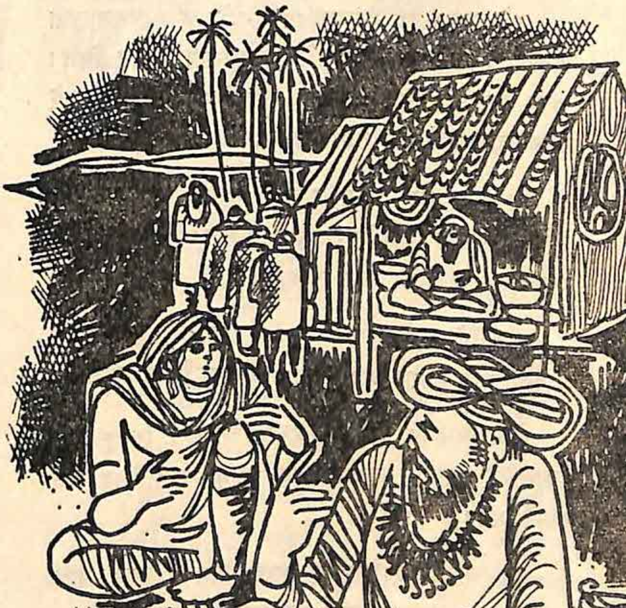
—তাতে কি হল? শিখে নিতে পার না?

—আমি আবার কি করে সে বিদ্যা শিখব? ফেরিওলা নিজের অক্ষমতা জানাল।

এবার রেগে তার বৌ বলে দিল—জ্যোতিষী হতে পারবে না তো আমায় তালাক দাও।

ফেরিওলা বেচারা আর কি করে? শেষে আর উপায় না দেখে সে জ্যোতিষী হবার চেষ্টায় বের হল।

ফেরিওলা বাজার থেকে একটা শতরঞ্জি কিনল আর একটা চাদর। কিছু কাগজপত্রও কিনল। তারপর এই সব নিয়ে সে বসবার মত একটা জায়গা খোঁজ করতে লাগল।



স্নানঘরের সামনের রাস্তার ফুটপাথের ধারে একটা গাছ ছিল। তার তলায় সে তার শতরঞ্জি ও চাদর বিছিয়ে কাগজপত্র নিয়ে জ্যোতিষী সেজে বসল।

জ্যোতিষ বিদ্যা তো তার একেবারেই জানা ছিল না। কিন্তু বৌকে তালাক দিতে হবে এই ভয়ে বেচারা সেখানে জ্যোতিষী সেজে বসে রইল।

এদিকে সেইসময় স্নানঘরে স্নান করতে এসে-ছিলেন রাজকুমারী। স্নান করবার সময় তিনি তাঁর খুব দামী একটা আংটি এক দাসীর হাতে রাখতে দিলেন।

বেচারী দাসীটি ভাবল—এই দামী আংটি যদি তার হাত থেকে কোথাও পড়ে যায় তাহলে তো তার বড়ই বিপদ হবে।

এই ভেবে সে স্নানঘরের বাইরের দেওয়ালের একটা গর্তের মধ্যে আংটিটা লুকিয়ে রেখে দিল। পরে গর্তটা যাতে চিনতে অসুবিধা না হয় তাই সেখানে একটি চুল রেখে দিল।

এরপর সে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে রাজকুমারীর স্নান শেষ হল। তিনি দাসীকে বললেন—আংটিটা দাও আমায়।

দাসীটি বড়ই ভুলো মনের। সে এইটুকু সময়ের মধ্যেই ভুলে গেছে আংটিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।

রাজকুমারীর অবশ্য অনেক আংটি। কিন্তু তার কোনটাই দাসীর কাছে জমা রাখা আংটিটার মত দামী নয়।

সে আংটি হারিয়ে ফেললে দাসীর আর রক্ষে থাকবে না। বেচারা মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল।

আংটি খুঁজতে খুঁজতে সে স্নানঘরের বাইরে চলে এল। আর বাইরে এসেই দেখতে পেল এক জ্যোতিষী কাছেই বসে আছে। সেই ফেরিওলা জ্যোতিষীকে দেখে দাসীর প্রাণে খুব ভরসা এল। জ্যোতিষীর কাছে এসে বলল—জ্যোতিষী মশাই, রাজকুমারীর একটা দামী আংটি আমি হারিয়ে ফেলেছি। আপনি দয়া করে গণনা করে বলে দিন সেটা কোথায় রেখেছি। আংটি না পেলে আমার আর রক্ষে থাকবে না।

শুনে ফেরিওলা জ্যোতিষীর তো মাথায় বাজ পড়ল। কি যে বলবে তা সে ভেবেই পেল না। মনে মনে সে তার অবুঝ বৌকে খুব গালাগাল দিতে লাগল। উঃ, কি বিপদেই না সে তাকে ফেলেছে।

সে অবাক হয়ে দাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। দাসীর মাথার ওড়নাটার এক জায়গায় একটু ছেঁড়া ছিল। সেই ছেঁড়া ওড়নাটার মধ্যে থেকে তার কাঁধের কাছে এক গোছা সুন্দর চুল দেখা যাচ্ছিল।

তাই দেখে ফেরিওলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলতে লাগল—চোখের সামনে তো একটা ফুটো দেখছি আর সেই ফুটোর ভেতর থেকে এক গোছা সুন্দর চুল দেখা যাচ্ছে—এছাড়া আর তো কিছুই আমার চোখে পড়ছে না।

দাসী তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল, যেই শোনা অমনি তার মনে পড়ে গেল, আংটিটা তো সে দেয়ালের একটা ফুটোর মধ্যেই রেখেছিল। আর তার সঙ্গে একটা চুলও রেখে দিয়েছিল।

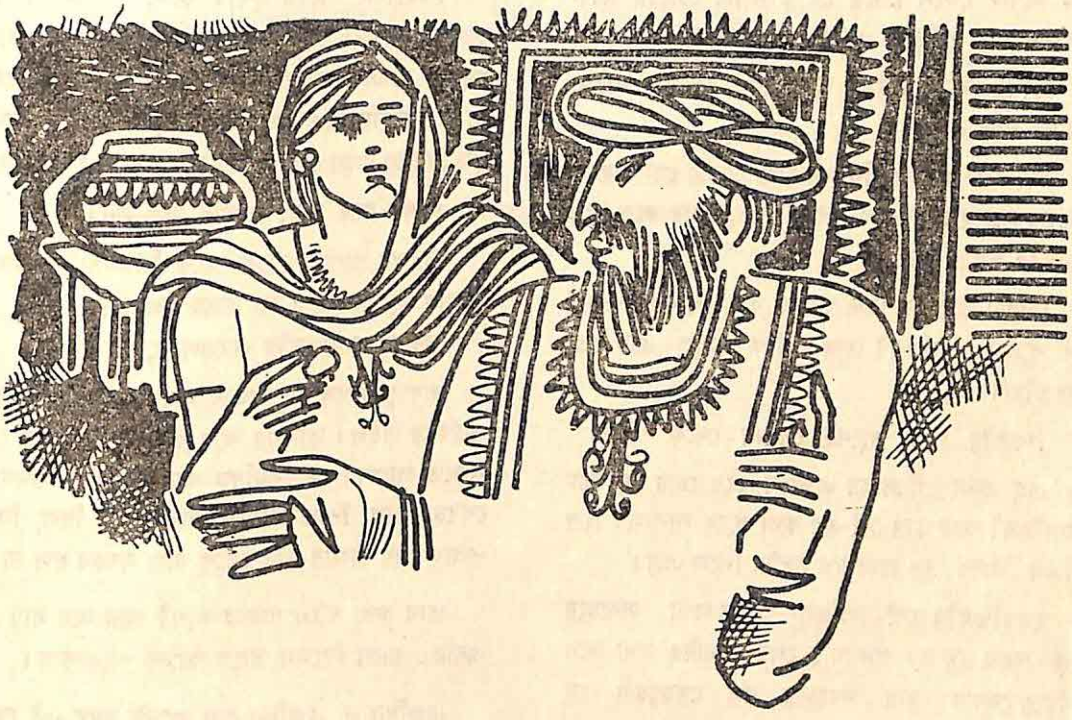
দাসী এবার চট করে আংটিটা বের করে এনে রাজকুমারীর হাতে দিল। আর স্নানঘরের বাইরে বসে থাকা জ্যোতিষীর খুব প্রশংসা করতে লাগল।

রাজকুমারী প্রাসাদে ফিরে এসে তার বাবাকে সেই জ্যোতিষীর গুণের কথা সবিস্তারে শোনালেন। মেয়ের কথা শুনে রাজা খুব খুশী হয়ে জ্যোতিষীকে ডেকে অনেক পুরস্কার দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে দরবারের একজন জ্যোতিষী নিযুক্ত করলেন।

ফেরিওলার বৌ তো মহা খুশী। কিন্তু বেচারা ফেরিওলার প্রাণ তো ভয়েই উড়ে যায়। একদিন নির্ঘাত ধরা পড়ে রাজার হাতে বেচারার বেঘোরে প্রাণটি না চলে যায়।

ক'দিন তো এরকম করে কাটল। হঠাৎ একদিন রাজার মহলে চুরি হল। চোর অনেক টাকার জিনিষ পত্র চুরি করে নিয়ে পালাল।

রাজা ডেকে পাঠালেন জ্যোতিষীকে। হুকুম হল—চল্লিশ দিনের মধ্যে চোরের সন্ধান না দিতে পারলে তোমার গর্দান যাবে।



ফেরিওলা বাড়ী এল। ভয়ে চিন্তায় তার তো প্রাণ যায় যায় অবস্থা। বৌকে সমস্ত কথা জানাল। তারপর বলল—চল্লিশ দিন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ শহর ছেড়ে পালাতে হবে, নাহলে গর্দান যাবে।

তারপর চল্লিশ দিনের হিসাব যাতে ভুল না হয়ে যায় তাই সে চল্লিশটা খেজুর এনে একটা মাটির হাঁড়িতে রেখে দিয়ে বৌকে বলল—প্রতি রাত্রে আমায় তুমি একটি করে খেজুর এই হাঁড়ি থেকে বের করে খেতে দিও। যেদিন হাঁড়ির খেজুর ফুরিয়ে যাবে সেইদিন জানবে যে চল্লিশ দিন পুরো হয়ে গেছে আর আমরা সেই দিনই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাব।

এদিকে যে চোরেরা রাজার মহলে চুরি করেছিল তাদের সংখ্যাও ছিল চল্লিশ ।

তারা ঠিক করল তাদের মধ্যে থেকে একজন করে চোর প্রতি রাতে জ্যোতিষীর বাড়ী গিয়ে খবর নেবে চোর ধরবার জন্য জ্যোতিষী গণনা করে কি উপায় বার করেছে।

রাত হল। জ্যোতিষীর বৌ সেই মাটির হাঁড়ি থেকে একটা খেজুর বার করে এনে তার স্বামীর হাতে দিল। জ্যোতিষী বেজার মুখে বলল—চল্লিশটা থেকে এইটেই প্রথম তো?

বৌ উত্তর দিল—হাঁ।

এদিকে হল কি সেই চোরটা লুকিয়ে লুকিয়ে জ্যোতিষী আর তার বৌ-এর কথাবার্তা শুনছিল। তাদের কথা শুনে তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে জ্যোতিষী চোরদের খবর জেনে গেছে, তা না হলে সে একথা বলবে কেন যে—এটা প্রথম কিনা অর্থাৎ সেই প্রথম চোরটা কিনা।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে চোর আড্ডায় পৌঁছে সর্দারকে বলল—এ জ্যোতিষী তো যেমন তেমন নয়। সে

এর মধ্যেই জেনে গেছে যে চল্লিশটা চোরের মধ্যে একজন তার বাড়িতে এসেছে খবর নিতে।

সর্দার দ্বিতীয় রাত্রে আর একটা চোরকে পাঠাল খোঁজ খবর নিতে।

দ্বিতীয় রাতে ফেরিওলা জ্যোতিষীর বৌ আগের রাতের মত হাঁড়ি থেকে একটা খেজুর বার করে এনে স্বামীর হাতে দিল।

চোরটা লুকিয়ে ছিল তাদের কথা শোনবার জন্য। সে শুনল জ্যোতিষী তার বৌকে বলছে—এটা তো দ্বিতীয়টা।

দ্বিতীয় চোর শুনেই সেখান থেকে দৌড়।

এই ভাবে প্রতিরাত্রে একজন করে চোর লুকিয়ে জ্যোতিষী আর তার বৌ-এর কথা শুনে পালাল। আর চল্লিশ দিনের দিন চোরদের সর্দার নিজে এল।

জ্যোতিষীর বৌ বলছিল—আজকেরটা সবচেয়ে বড়—শহর ছেড়ে পালাবার শেষ দিনটার কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য সবচেয়ে বড় খেজুরটা সে রেখেছিল।

চোরেদের সর্দার এই কথা যখন শুনতে পেল তখন সে নিশ্চিত বুঝে গেল আর রক্ষা নেই তাদের। জ্যোতিষী তাদের কথা সব জেনে ফেলেছে।

চোরের সর্দার দৌড়ে এসে জ্যোতিষীর কাছে দাঁড়াল। হাত জোড় করে মাথা নীচু করে বলল—আমাদের ক্ষমা করুন পন্ডিত মশাই। আর আমরা চুরি করব না। চুরির সব মালপত্র এখনই এনে দিচ্ছি আপনার কাছে।

জ্যোতিষী তো অবাক।

কিন্তু সে বেশ গম্ভীর হয়ে রইল, কিছুই বলল না।

চোরেরা রাজমহল থেকে চুরি করা সমস্ত মাল রেখে যেতে, জ্যোতিষী সেগুলি রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে দিল।

রাজা খুশী হয়ে এবার তাকে আরও বেশী পুরস্কার দিলেন।

কিছুদিন পরের কথা। রাজা গেছেন শিকার করতে। সেখানে রাজা ঘাসের উপর বসা একটা ফড়িং ধরবার চেষ্টা করছিলেন। প্রথমবার ধরতে পারলেন না। দ্বিতীয়বারও ফড়িংটা উড়ে পালাল। কিন্তু তৃতীয়বারে রাজা সেটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে ফেললেন।

খুশী হয়ে রাজা হাসতে লাগলেন।

তারপর জ্যোতিষীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার মুঠোর মধ্যে কি আছে বল ত?

বেচারা জ্যোতিষীর আক্কেল গুড়ুম!

ঘাবড়ে গিয়ে সে রাজার হাতের মুঠোটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর খুব ধীরে ধীরে তার ঠোঁট নড়তে লাগল। সে বিড়বিড় করে বলছিল—প্রথমবার বেঁচে গেছি, দ্বিতীয়বারও ভাগ্য ভাল ছিল, কিন্তু এবার আর রাজার হাত থেকে বাঁচা সম্ভব হল না।

তার কথা শুনে রাজার খুশী আর ধরে না। এবারও রাজা দিলেন তাকে অনেক পুরস্কার।

একদিন না একদিন ধরা পড়েই যাবে এই ভেবে সে ঠিক করল, পাগল হয়ে যাবার ভান করে এই জ্যোতিষী জীবনের সংকট থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

এই ভেবে একদিন সে যখন স্নান করছিল তখনই ঠিক করল মাথা খারাপ হয়ে গেছে এই ভান করবার পক্ষে এইটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

সুতরাং একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে সে সোজা রাজার দরবারে উপস্থিত হল। রাজাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে জ্যোতিষী তাঁকে বাইরে নিয়ে এল।

সে ভেবেছিল, তার এই রকম কান্ড কারখানা দেখে সকলে তাকে বলবে যে সে পাগল হয়ে গেছে।

কিন্তু হল ঠিক উল্টো।

রাজাকে তুলে যেমনি জ্যোতিষী বাইরে এনেছে অমনি দরবার হলের ছাতটা হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল। কয়েকজন লোক সেখানেই ছাত চাপা পড়ে মারা গেল।

জ্যোতিষী রাজার প্রাণ রক্ষা করেছে—বেচারা স্নানঘর থেকে উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে রাজার প্রাণ বাঁচাবার জন্য এসেছিল—সবার মুখে তার প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ল। লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

এমন প্রভুভক্ত মানুষ পৃথিবীতে আর কি কেউ আছে ?

রাজা অবিলম্বে তাকে রাজ দরবারের প্রধান জ্যোতিষী বলে ঘোষণা করে দিলেন।

খুশীতে ফেরিওলার বৌ একেবারে উছলে উঠল। এবার যখন সে সাধারণ স্নানাগারে স্নান করতে গেল তখন সেখানে তার সম্মান দেখে কে? ঠিক সেই আগেকার প্রধান রাজ-জ্যোতিষীর বৌকে সকলে যেমন সম্মান করত, এখন তাঁরও ঠিক সেইরকম সম্মান!



রূপোর আওয়াজ

মাঞ্চুরিয়া

জীর্ণ কুঁজো শরীর, পরনের কাপড় ছেঁড়া ময়লা। দুটি চোখই অন্ধ। কাঁপা কাঁপা হাতে সেতার ধরে আছে। কিন্তু সেই মানুষটি যখন গলির মধ্যে দিয়ে দান করার পর যা কিছু বাঁচত তা সে কাপড়ের তৈরী একটা লম্বা মত থলিতে ভরে নিজের বুকের সঙ্গে বেঁধে রাখত। যাতে চোর-ডাকাত না নিতে পারে।



হেঁটে যেত, ছেলে বুড়ো সবাই তাকে ঘিরে ধরত। চারিদিকে সাড়া পড়ে যেত—অন্ধ গায়ক এসেছে—অন্ধ গায়ক এসেছে।

লোকটি সেতার বাজিয়ে গান গাইত, আর লোকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার সেই অপূর্ব দরদ ঢালা গান শুনত। শুনতে শুনতে তাদের চোখ জলে ভরে যেত।

সবাই পয়সা দিত তার গান শুনে। রূপোর টাকাগুলো অন্ধ গায়ক অসহায় অনাথদের দান করে দিত।

লোকটির বাড়ি-ঘর কিছুই ছিল না। সারা দিন ঘুরতে ঘুরতে যখন রাত হয়ে আসত সে পথের ধারেই কোন এক জায়গায় ঘুমিয়ে রাত কাটাত। তারপর সকাল হলে নিজের খেয়াল খুশীতে সে কোন একটা রাস্তা ধরে মাঠে ঘাটে আবার সারাদিন ঘুরে বেড়াত। লোকে তাকে বলত ভিখারী, আবার কেউবা বলত আস্তো একটা পাগল।

একবার সে এক গ্রামে গিয়ে গান গাইছে। লোকেরা তার চারধারে ঘিরে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গান শুনছে। আর

সেই শ্রোতাদের মধ্যে একজন ফিটফাট জামাকাপড় পরা বিদেশীও গান শুনছে। সে অন্ধ গায়কের কাছে এসে একেবারে তার গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

গান শেষ হলে সব লোক যে যার কাজে ফিরে গেল। কিন্তু সেই অচেনা লোকটা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সুযোগ বুঝে অন্ধ গায়ককে একা পেয়ে সে তার ওপর এক ঝাপ্টা মেরে তার সেই রুপোর টাকার থলিটা কেড়ে নিয়ে দৌড় দিল। গায়ক চিৎকার করতে লাগল—চোর! চোর! দিন দুপুরে ডাকাত আমার সর্বস্ব লুটে নিয়ে পালাচ্ছে... ধর ধর ওকে।

চিৎকার শুনে চারধার থেকে লোকজন দৌড়ে এল আর চোরটাকে চুরির মালশুদ্ধ ধরে ফেলল। সকলে তাকে ছি ছি করতে লাগল, তুই এই অন্ধ ভিখারীর টাকা চুরি করে পালাচ্ছিস। তোর কি কোন রকম দয়া মায়া লজ্জা কিছুই নেই? —মানুষ না শয়তান তুই? নীচ—পশু।"

অচেনা লোকটা এতক্ষণ চুপ ছিল। এবার উলটে তেড়ে উঠে বলল—তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? এ থলি তো আমার, এই ভিখারীটার কাছে এত পয়সা কোথা থেকে আসবে? পয়সা যদি তার থাকত তাহলে কি ও ভিক্ষা করে বেড়াত? আর এই রকম ছেঁড়া কাপড় পরে থাকত?

তার এই কথা শুনে লোকেরা হঠাৎ যেন কেমন ধাধাঁয় পড়ে গেল। তবুও চোরটাকে অনেকে বলল—থলিটা অন্ধ গায়ককে ফিরিয়ে দাও। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও লোকটা থলি ফেরত দিল না। তখন লোকেরা তাকে ধরে আদালতে নিয়ে গেল।

আদালতে যাবার পর বিচারক অন্ধ গায়কের কথা শুনলেন বেশ সদয় ভাবে। শুনে বেশ কড়া করে সেই অচেনা লোকটাকে বললেন—তুমি দিনেদুপুরে এ বেচারা অন্ধ ভিখারীর টাকা চুরি করেছো। এ রাজ্যে এক অতি ন্যায়পরায়ণ রাজা রয়েছেন, তুমি জানোনা? সব জেনে শুনেও তোমার এত সাহস?

বিচারকের কথায় যেন লোকটা কোনও ভ্রূক্ষেপ করল না। যেন কথাগুলো তার কানেই যায়নি। শুধু তাই নয়, সে খুব রাগ দেখিয়ে, বুক ফুলিয়ে জোর গলায় বলল—আপনি কার সংগে কথা বলছেন তা জানেন? আমি কত বড় বংশের ছেলে আর আমার মত অবস্থার লোক একটা অন্ধ ভিখারীর টাকা চুরি করবে এ কখনও হয় নাকি? মশাই, আপনার মত বিচারককে আমি এক হাতে আকাশে তুলতে পারি আবার মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে পারি, আপনি ভেবেছেন কি? স্বয়ং রাজার সংগে আমার সম্পর্ক রয়েছে। আমার পরিবারের লোক রাজ পরিবারের সংগে ওঠে বসে। রাজপুত্ররা, রাজ কুমারী, রাজদরবারের সকলে আমায় জানে। এমন কে আছে যে আমার বাবার নাম শোনেনি। কেবল মাঞ্চুরিয়াই নয়, সাত সমুদ্র পারেও তাঁর খ্যাতি। আপনিও আমার বাবাকে নিশ্চয় চিনবেন, বুড়ো হয়ে এখন তিনি একটু কুঁজো হয়ে গেছেন।

বিচারক জানতে চাইলেন তার নাম কি।

লোকটা রহস্য ভরে বলল—যথা সময়ে নামও জানতে পারবেন, কিন্তু এখন নয়।

মনে হল বিচারক মশাই এ সব শুনে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। রহস্যের কুল কিনারা পেলেন না। তাই ভেবে চিন্তে পরদিনের জন্য মামলা মুলতুবি করলেন। বললেন—কাল এর বিচার করব।

অচেনা লোকটাকে হাজতে রাখা হল। আর সেই রাতে বিচারক চুপিচাপি এলেন সেই হাজতের মধ্যে সেই লোকটার সংগে দেখা করতে...। কথাবার্তা হল, তারপর সেই অন্ধ ভিখারীর টাকার থলিটা খুলে রুপোর টাকা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। তৃতীয় আর কেউ এ ঘটনাটা দেখতে পেল না, কেবল হাজত ঘরের নির্বাক দরজা জানলা আর দেয়ালগুলিই এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল।

দ্বিতীয় দিন আবার ঘটা করে আদালত বসল। আর সেদিন বিচারক একেবারে যেন অন্য মানুষ।

তিনি অন্ধ ভিখারীকে খুব ধমক দিয়ে বললেন-- পাঁজী বুড়ো, পরের পয়সা দেখে তোমার লোভ আর হিংসা হয়েছে, তাই মিথ্যা কথা বলেছ। জাননা গরীব বড়লোক মানুষ নিজের ভাগ্যে হয়। এই ভালো লোকটির টাকার থলিটা মিথ্যে কথা বলে কেড়ে নিতে চাও? তুমি কি ভাবছ যে তার টাকাগুলো এই ভাবে পেয়ে গেলে তুমি বড়লোক হয়ে যাবে? তোমার এত বয়স, চুল দাড়ি সাদা হয়ে গেছে তবু এরকম লোভ করতে লজ্জা নেই?

বেচারা অন্ধ বিচারকের কথা শুনে তো অবাক। সে যে কি বলবে ভেবেই পেল না। তার নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বেচারা মাটিতেই শুয়ে পড়ল সেখানে, দেখে মনে হয় যেন মাটিতে কান পেতে সে কিছু শুনছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাটির উপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সে যেন কী খুঁজতে লাগল।

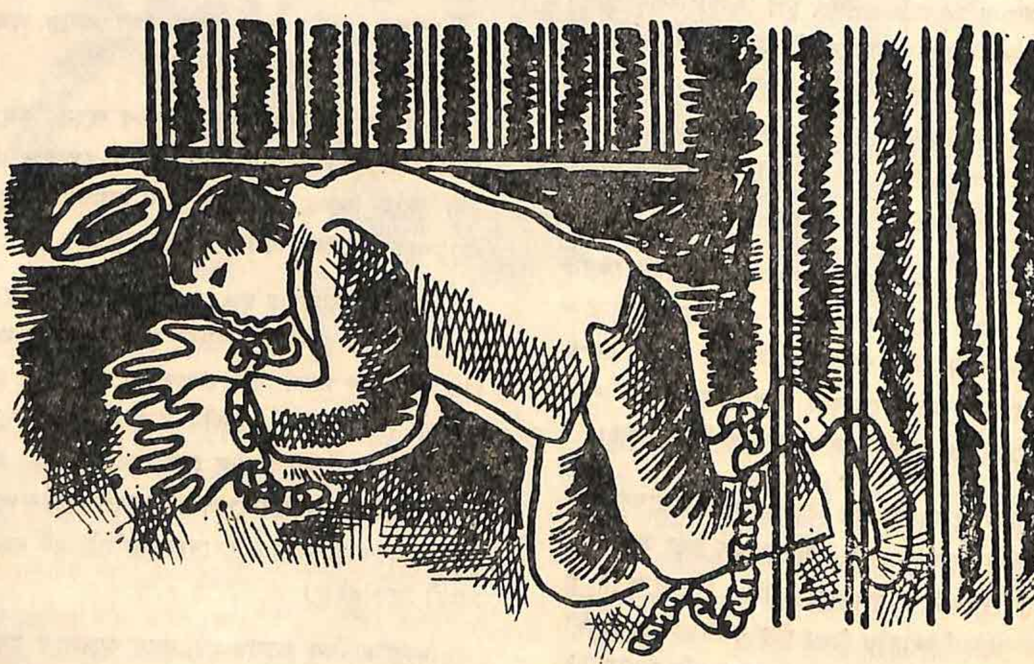
বিচারক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এরকম করছ কেন তুমি?

অন্ধ গায়ক বলল—হুজুর আমি যেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি, যেন রুপোর মত কোন এক ধাতুর আওয়াজ। ভাবছিলাম শব্দটা কোথা থেকে আসছে। তাই খুঁজে দেখছি, পেলেই সে রুপো আমি আপনাকে উপহার দেব।

তারপর সে একটু থেমে আবার বলল—আমি অন্ধ, চোখে তো কিছু দেখতে পাইনা তাই কান দিয়ে সব শুনি। সেই রুপোর আওয়াজ আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি। আপনাদের মধ্যে আর কেউ কি সে শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? আগের কালে লোকে বলত রুপোর আওয়াজ বহু যুগ ধরে শুনতে পাওয়া যায়...। আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি সেই শব্দ। সম্ভবত চিরকাল ধরে ভবিষ্যতে এই শব্দ শোনা যাবে ...তারপর একদিন এ দুনিয়ার সমস্ত পাথর গলে যখন জল হয়ে যাবে, তখন আর এই রুপোর আওয়াজ শোনা যাবে না—আর তা কখনই শুনতে পাওয়া যাবে না...

অন্ধ নিজের কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল, তারপর একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

জ্ঞান ফিরতেই দেখল যে সে উঁচু উঁচু দেওয়াল দেওয়া একটা বন্ধ ঘরে পড়ে আছে। তার হাতে শিকল বাঁধা আর পায়ে বেড়ি।



এ ঘটনার পরে কেবল অনেক বছর নয় অনেক যুগ পার হয়ে গেছে। এখন আর সেই অন্ধ ভিখারী নেই। নেই আর সে বিচারকও। সে কারাগারও কবে ভেঙে গেছে। সেখানে কেবল ভাঙা পাথর পড়ে আছে।

অমাবস্যার রাতে কখনো কখনো শোনা যায় সেখানে কে যেন বলছে—রূপোর আওয়াজ আর শোনা যাবে না—শোনা যাবে না—কখনও শোনা যাবে না।

লোকে ওখানে রাতে একা চলাফেরা করতে ভয় পায়। লোকে বলে ওখানে নাকি ভূত আছে, ঐ আওয়াজ ভূতের।

স্বর্গের মানুষ

য়ুগোশ্লাভিয়া

দিনটা ছিল প্রচণ্ড গরম। সূর্য থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। এমনি শরীরে জ্বলুনিধরা গরমের দুপুরেও এক তুর্কি কিষাণ ও তার বৌ নিজেদের ভুট্টা ক্ষেতে কাজ করছিল।

কিষাণ ঘাম মুছতে মুছতে বৌকে বলল—অনেক বেলা হয়ে গেছে—

কিষাণ বৌ-এর দিকে তাকিয়ে দেখল, তার মুখ খানা গরমে লাল টকটক করছে। কিষাণ বলল—তুমি ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর, আমি ঘোড়াকে জল খাইয়ে আসছি। তারপর খাবার দাবারের ব্যবস্থা করা যাবে।

এই বলে কিষাণ নিজের কোদালখানা একটা গাছের ডালে রেখে দিয়ে, কাছেই আর একটা গাছের গুঁড়ির সংগে বাঁধা ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেল।

কিষাণের বৌ তার কাস্তেখানা ফেলে ঘন গাছের ছায়ায় তৈরি নিজেদের কুটিরের মধ্যে শুয়ে পড়ল। রুমাল দিয়ে সে হাওয়া খেতে লাগল। আর ঠিক সেই সময়ে বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। কিষাণের বৌ তাড়াতাড়ি তার কাপড় চোপড় সামলে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—কে?

অচেনা এক লোকের গলা শোনা গেল—আমি একজন পথিক। বড় তেষ্টা পেয়েছে একটু খাবার জল পেতে পারি?

কিষাণের বৌ একটা বদনা ভরে জল এনে তার সামনে রেখে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—কোথা থেকে আসছ তুমি?

—আমি? আমি অনেক দূর থেকে...একদম অন্য এক দুনিয়া থেকে আসছি...এই বলে সেই লোকটা ঢক ঢক করে জল খেতে লাগল।

—বলছ কি তুমি? অন্য দুনিয়া থেকে মানে তো স্বর্গ থেকে...তাহলে তুমি কি স্বর্গ থেকে এসেছ?—অবাক দৃষ্টিতে এবার কিষাণের বৌ লোকটার সাজ পোষাক দেখতে লাগল। তার পোষাকটা ছিল সার্ভিয়ার পর্বত আরোহীদের পোষাকের মত, কিন্তু কিষাণের বৌ-এর চোখে এ ধরনের পোষাক খুব অদ্ভুত লাগল।

লোকটি বলল—হ্যাঁ। এতে এত আশ্চর্য হবার কি আছে? তার বলার ঢঙটা খুব সহজ। যেন স্বর্গ থেকে আসাটা একটা নিত্যকার সাধারণ ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।

—তাহলে দয়া করে আমায় একটা খবর দাও। আমার প্রথম স্বামী ছিল মিজো, মাত্র কমাস হল সে মরে গেছে। তার মৃত্যুর পর আমি আমার দ্বিতীয় স্বামীকে বিয়ে করেছি। তুমি কি স্বর্গে মিজোকে কখনও দেখেছ?

—মিজো? মিজোই কি তোমার প্রথম স্বামী? খুব আগ্রহের সুরে লোকটি জিজ্ঞাসা করল। তার-পর বলল—মিজো তো বলতে গেলে স্বর্গে আমার সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী— আমরা দুজনে খুবই বন্ধু...প্রায় একই সঙ্গে আমাদের খাওয়া-বসা। মিজোকে জানবো না এ কেমন করে হয়।

তুর্কির বউ খুশীর চোখে লোকটাকে দেখল। এ কথা শুনে জিজ্ঞাসা করল—সে বেশ সুখে আছে তো স্বর্গে?

উদাস সুরে লোকটি বলল—সুখে হোক দুঃখে হোক বেচারার দিন তো কোনরকমে কেটেই যাচ্ছে। তবে স্বর্গে মিজোর টাকা কড়ির বড় অভাব। তাই মাঝে মাঝে তাকে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে হয়... এছাড়া আর কোন কষ্ট মিজোর নেই।

টাকা কড়ির অভাবে স্বর্গে মিজোর কষ্ট হচ্ছে শুনে তুর্কির বৌ-এর বড় দুঃখ হল। সে বলল—আমার একটি অনুরোধ যদি তুমি রাখ তাহলে বড়



খুশী হব। আমি যদি মিজোর জন্যে এখান থেকে কিছু টাকা পাঠাই, তাহলে তুমি কি সে টাকাটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে?

অচেনা পথিক খুবই সহানুভূতির সুরে বলল —তুমি একথা বলছ কেন? স্বর্গে আমরা দুজনে পরম বন্ধু, সদা সর্বদা দেখা হচ্ছে। তোমার মিজোর জন্যে এইটুকু কাজ করতে পারব না?

মৃত স্বামীর সঙ্গে লোকটির এত বন্ধুত্বের কথা শুনে কিষাণ বৌ-এর মন গলে গেল।

সে এবার চট্ করে ঘরের মধ্যে গেল। বহুকষ্টে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজকার করা টাকাগুলো বাক্স থেকে বার করে থলিতে করে সেই লোকটির হাতে তুলে দিল।

লোকটা আর কোন কথা না বলে চলে গেল। আর তুর্কি মহিলা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে চলে যেতে দেখতে লাগল। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে দেখা গেল সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গাছপালার আড়ালে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। মহিলার মনে বড় শান্তি হল এই ভেবে যে টাকাটা হাতে পেলে মিজো কিছুদিন শান্তিতে আর আরামে স্বর্গে থাকতে পারবে।

এদিকে ঘোড়াকে জল খাইয়ে ঘোড়াতে চড়ে কিষাণ ঘরে এল। সে বৌকে জিজ্ঞাসা করল—গলা শুনতে পাচ্ছিলাম, কার সঙ্গে কথা বলেছিলে?

—একজন লোক এসেছিল স্বর্গ থেকে। জল খেয়ে গেল। তার কথা কি তুমি শুনতে পেয়েছিলে? সে বলছিল মিজো বেচারা স্বর্গে বড় কষ্ট পাচ্ছে। টাকাকড়ির অভাবে স্বর্গে তার মোটেই আরাম নেই। একটু চা, একটু তামাকের জন্যে তাকে অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। ...তবে তার জন্য এ পৃথিবী থেকে আমরা আর কতটা করতে পারি বলো, তবে তবু কিছু ...

বৌ এর কথা শেষ হবার আগেই তুর্কি বলে উঠল—তবু কিছু ... কি?



বৌ বলল—এই কিছু টাকা পয়সা তাকে পাঠিয়ে দেওয়া এখান থেকে ... আর কি ...

শঙ্কিত তুর্কি জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি সত্যিই তাই করলে ?

—হাঁ টাকা পাঠিয়ে দিলাম। লোকটি ভাল, দয়া করে আমার অনুরোধ রাখল। এটাও তো খুশীর কথা। টাকাগুলো সে স্বর্গে পৌঁছে মিজোর হাতে দেবে। আর একটা খুব ভাল কথা বলছিল সে—স্বর্গে মিজো নাকি তার একেবারে পড়শী।

—তুমি কি তাকে টাকা দিয়েছ ?

—হাঁ, বৌ বলল।

তুর্কি কিষাণের যেন মাথায় বাড়ি পড়ল। বৌ-এর কথাগুলো শুনে এবার খুব রেগে বলল—তুমি এত বড় বোকা। মরা লোক কি আর কখনও দুনিয়ায় বেড়াতে আসে ? ... ঐ লোকটা নিশ্চয় একটা জোচ্চোর। গেল কোন দিকে ? আমি এক্ষুনি তাকে ধরে মজা দেখাচ্ছি।

বৌ সামনের পথটা দেখিয়ে দিল।

কিষাণ নিজের ধারাল ছুরিটা হাতে বাগিয়ে ধরে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে চড়ে বসল। তারপর হাওয়ার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সেই দিকে যে দিকে ঠগ্ লোকটা তক্ষুনি চলে গিয়েছে।

এদিকে লোকটির মনেও ভয় ছিল। সে ঠিকই বুঝেছিল টাকা পাঠাবার কথা যখন তুর্কি কিষাণের কানে যাবে তখন তার আর রক্ষে থাকবে না। সে তাকে যেভাবে হোক মেরেই ফেলবে।

ঠিক এমনি সময় সে পেছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পথে ধুলোও উড়তে দেখল। একবার মাত্র পেছনে তাকিয়ে লোকটার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ভয়ে। মরিয়া হয়ে সে ছুটতে লাগল। কোন রকমে প্রাণটা বাঁচাবার জন্যে। সামনে একটা নদীর পুল পেরিয়েই দেখতে পেল একটা ময়দার কল। কলটা জলের স্রোতের সাহায্যে ঘুরছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে সেই ময়দাকলের ঘরে ঢুকে পড়ল সে। সেখানে ময়দাচাকির লোক ঘাড় গুঁজে কলের চাকা ঘোরাচ্ছিল। ঠগ লোকটি সেই কলওয়ালার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল—মহা বিপদ তোমার ... ।

ময়দাকলওয়ালা হকচকিয়ে গিয়ে বলল—কেন, কি হয়েছে ?

—ঐ দেখো—লোকটা রাস্তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল।

চাকিওয়ালা কিছু বুঝতে না পেরে আবার বলল—কি হয়েছে বলতো ?

আরে প্রাণটা বাঁচাও—ঐ তুর্কিটা ছুরি নিয়ে তোমায় খুন করবার জন্য খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

—কিন্তু কেন ? আমি কি করেছি ? ঘাবড়ে গিয়ে কলওয়ালা বলল। তার গম পেষার কাজ মাথায় উঠল। সে হতভম্বের মত অচেনা লোকটিকে দেখতে লাগল।

ঠগ লোকটি বলল— কেন খুন করতে আসছে তা তুমিই জান। অজান্তে তুমি কোন ভয়ানক অপরাধ অপরাধ করেছ বোধ হয় ... ।

ময়দা চাকিওয়ালা এবার কল ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল সত্যি সত্যি এক তুর্কি ঘোড়ায় চড়ে তার দিকে ছুটে আসছে। তার চেহারা রাগে লাল হয়ে গেছে আর তার হাতে খোলা চকচকে একটা ছুরি।

বেচারা ময়দা চাকিওয়ালা ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে এ আবার কি বিপদে পড়ল সে। এখন করে কি ... । অচেনা লোকটাকেই ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—তা হলে আমি কোথায় পালাই, কি করি, তুমিই বলে দাও ভাই।

ঠগ লোকটি একটু ভেবে নিয়ে বলল—আচ্ছা তুমি এক কাজ কর। এটা করতে পারলে হয়ত তোমার প্রাণ বাঁচতে পারে।

আশান্বিত হয়ে ময়দা কলওয়ালা পরম ভরসায় তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তাহলে কি করব শীগগির বলে দাও।

—তুমি চট করে আমার পোষাকটা পরে নাও আর পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাও। আমি তোমার পোষাক পরে এখানেই আছি। আমার সঙ্গে সে যদি মারামারি করতে চেষ্টা করে তবে আমি তার সমস্ত দাঁতগুলো ভেঙ্গে দেব। তুর্কি তখন বুঝবে কার পাল্লায় পড়েছে ও ... যাক এখন তুমি তো পালাও।

এই কথা বলে তাড়াতাড়ি করে লোকটি নিজের পোষাক খুলে ময়দা কলের মালিককে দিল আর নিজে পরে নিল সেই আটার গুঁড়োয় ভর্তি পোষাক যেটা চাকিওয়ালা পরে ছিল।

প্রাণ ভয়ে বেচারা চাকিওয়ালা এই অকারণ বিপদ থেকে বাঁচবার জন্যে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল। আর সেই প্রতারকটা নিজের গায়ে খুব করে আটা মেখে ঠিক ময়দা কলওয়ালার মত করে সাজল। তারপর গম পিষে বস্তায় ভরতে লাগল। এমনিভাবে কাজ করতে লাগল যেন সে শুধু নিজে নয় তার চোদ্দ পুরুষ কেবল গম পেষার কাজই করে আসছে। যেন গম পেষা ছাড়া সংসারে আর কিছুতেই তার কোন আগ্রহ নেই।

ইতিমধ্যে সেই তুর্কি কিষাণ ঘোড়ায় চড়ে সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে সেই ময়দা কলঘরের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল। ঘরে ঢুকে লোকটাকে ময়দা কলে কাজ করতে দেখে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল---সেই ঠগটা গেল কোথায়?

—ঠগ? কোন ঠগের কথা বলছ তুমি? তুর্কির কথা যেন সে কিছুই বুঝতে পারেনি এমনি ভান করে আগের মতোই সে গম পিষে বস্তায় ভরতে লাগল।

আরে সেই অদ্ভুত পোষাক পরা লোকটা, আবার কে? খুব রেগে তুর্কি কিষাণ বলতে লাগল—পাজি জোচ্চোরটা নিজেকে স্বর্গবাসী বলে আমার ভালো-মানুষ বৌ-কে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে পালিয়েছে। কোথায় গেল সে—তাকে একবার পেলে এই ছুরি দিয়ে এবার সত্যি সত্যি স্বর্গে রওনা করে দেব—রাগে তুর্কির রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে।

কলের পেষা আটা বস্তায় ভরতে ভরতেই লোকটা মাথায় হাত রেখে বলল—আমি কাউকে জানিনা—স্বর্গবাসী বা নরকবাসী আমি কোন লোককেই দেখিনি।

তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হয়েছে এই রকম ভাব করে পরক্ষণেই সে বলল—হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। এই একটু আগেই একটা লোক এই পথ দিয়ে গেছে, তার সাজ-পোষাক একেবারে অদ্ভুত ধরনের। লোকটা ডান দিকের রাস্তা ধরে জঙ্গলের দিকে গেছে—সম্ভবত সেই লোকটারই খোঁজ করছ তুমি।

এতটা শোনাই তুর্কির পক্ষে যথেষ্ট। সে শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে দৌড়ে গিয়ে ডান দিকের যে পথটা জঙ্গলের দিকে গেছে সেই পথ ধরল। তার ঘোড়া সেইখানেই গাছের সঙ্গে বাঁধা রইল। একটা উঁচু টিলা দেখতে পেয়ে সে তার উপর চড়ল, আর তক্ষুনি সেই লোকটাকে দেখতে পেল। তার গায়ে অদ্ভুত সাজ-পোষাক। ব্যস আর কাল বিলম্ব না করে দৌড়তে লাগল তাকে ধরবার জন্যে।

তাকে দৌড়ে আসতে দেখে বেচারা ময়দাচাকি-ওয়ালা যথাসাধ্য দৌড়তে লাগল। কিন্তু সে তুর্কির সঙ্গে পারবে কেন, অল্প সময়ের মধ্যে তুর্কি তাকে ধরে ফেলল। প্রথমেই ময়দাকলওয়ালার ঘাড় ধরে তাকে খুব মারল। মারতে মারতে যখন হাত ব্যথা করতে লাগল তখন তুর্কি ছুরিটা হাতে করে তার সামনে নাচাতে নাচাতে বলল—টাকার থলি বার কর।

—টাকার থলি? ময়দাকলওয়ালা আশ্চর্য হয়ে বলল।

হাঁ, হাঁ, যে টাকার থলি তুমি আমার বোকা বৌএর কাছ থেকে ঠকিয়ে নিয়েছো।

ঘাবড়ে গিয়ে ময়দাচাকিওয়ালা বলল—দেখ সত্যি করে বলছি, তোমার বৌ কে তাও আমি জানিনা। আমি তাকে কি করে ঠকাব বল, তুমি ভেবে দেখো নিজেই।

—চুপ কর, একদম বাজে কথা বলবেনা—তুর্কি গরীব আটাকলওয়ালার সরু গলা মজবুত হাতে টিপে ধরল—ভয়ে লোকটার চোখ যেন বেরিয়ে আসছে।

তুমি আমার বৌকে বলেছ তুমি স্বর্গ থেকে এসেছ আর এই বলে তার কাছে টাকা নিয়েছ। তুমি তাকে বুঝিয়েছ তুমি স্বর্গে ফিরে গিয়ে আমার বৌএর প্রথম স্বামী মিজোকে সেই টাকা দেবে।

—মিজো কে? স্বর্গের কথারই বা মানে কি? এ সব তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না। সে দারুন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে তুর্কির হাতের ধারাল ছুরির দিকে তাকিয়ে বলল। তাহলে তুমি কে, সত্যি কথা বল—এবার তুর্কি কিষাণের গলায় যেন একটু সন্দেহ।

—আমি ময়দাচাকিওয়ালা।

—অপরাধী না হলে তুমি দৌড়ে পালাচ্ছিলে কেন?

লোকটি ভয়ে ভয়ে বলল—কেন পালাচ্ছিলাম তা জানিনা। তুমি যখন ছুরি নিয়ে রাগ করে ময়দাকলের দিকে আসছিলে তখন সেই লোকটি বলল যে তুমি আমায় খুন করবার জন্য আসছো। তাই সেই ভালো লোকটি দয়া করে তার পোষাকটা আমায় পরতে দিয়ে সে নিজে আমার পোষাক পরে ময়দাকলের মধ্যে কাজ করতে লাগল, যাতে আমি পালিয়ে তোমার হাত থেকে প্রাণটা বাঁচাতে পারি।

শুনে তুর্কির আক্কেল গুড়ুম!

জিজ্ঞাসা করল—লোকটা কোথায় এখন?

—সে তো ময়দাকলের ঘরে আছে।

তার কথা শুনে তুর্কি তখনই ময়দাকলের দিকে দৌড়ল আর তার পেছনে পেছনে বিনা দোষে মার খাওয়া লোকটিও দৌড়ে গেল ময়দাকলের ঘরে। হাঁপাতে হাঁপাতে তারা দুজনে যখন সেখানে পেঁছাল, দেখে ময়দাকল বন্ধ। বাইরে থেকে দরজায় তালা ঝুলছে। আর সেই ঠগ গাছের সঙ্গে বাঁধা তুর্কির ঘোড়াটায় চড়েই সেখান থেকে পালিয়ে গেছে।

রাগে দুঃখে তুর্কি কিষাণ এবার নিজের কপাল চাপড়াতে লাগল। তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে নিজের বাড়ি গেল।

বৌ স্বামীর পথ চেয়ে দোরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে পায়ে হেঁটে আসতে দেখে আর তার হতাশ ক্লান্ত মুখ দেখে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—ঘোড়া কোথায়?

—আর কি শুনবে? তুর্কি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—তোমার মিজোর কথা মনে পড়ল, তার কষ্ট দূর করবার জন্য তুমি এতদিনের এত কষ্টে জমান টাকা গুলো স্বর্গে পাঠিয়ে পুণ্য কাজ করলে। আমিই বা কম যাই কেন। আমিও ভাবলাম মিজো বেচারা স্বর্গে গিয়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে সারা হচ্ছে, ঘোড়াটা স্বর্গে তাকেই পাঠিয়ে দিই। সে আনন্দ করুক।

—তাহলে তো খুবই বুদ্ধির কাজ করেছ তুমি। বৌ এতক্ষণে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আসল কথাটা বুঝতে পারল।

—হাঁ, তা তুমি বলতে পার বটে, আমি তোমার চেয়ে কিছু বেশী বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছি।

এবার নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে দুজনেই খুব হাসতে লাগল। ঠিক করল ভবিষ্যতে এরকম কাজ তারা আর করবেনা। তারপর আর কি, দুজনেই নিজের নিজের কাজে লেগে গেল।

সোনালী হাঁস

নরওয়ে

এক ছিল বুড়ি, খুবই সাদাসিধে মানুষটি। এত ভালো যে লোকে তাকে সত্যযুগের বুড়ি বলত।

নিজের ছোট্ট ঘরে সে একাই থাকত। তার ধন দৌলত কিছুই ছিলনা। কেবল কয়েকটা হাঁস ছিল। সোনালী সুন্দর হাঁস। সেই হাঁসগুলোই ছিল তার একমাত্র সম্পত্তি।

বুড়ি তাদের প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসত। ভোর বেলায় উঠে হাঁসগুলোর সুন্দর সুন্দর ঠোঁটে হাত বুলিয়ে দিত। তাদের দিকে তাকিয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে যেত।

আর ছিল একটি ছোট্ট ধপধপে ফরসা মেয়ে, ঠিক যেন শ্বেতপাথরের পুতুল একটি। সেই ছোট্ট মেয়ে বুড়ির হাঁসগুলোর দেখাশোনা করত। খুব মিষ্টি করে কথা বলত সে। গুনগুন সুর করে কত রকমের গান গাইত, সারাদিন খেলা করত। বুড়ির এই সব দেখে আনন্দ আর ধরত না।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মেয়েটি হাঁসগুলোকে পুকুরে নিয়ে যেতো সাঁতার কাটাতে। সূর্যাস্তের রঙ্গে আকাশ রঙ্গীন হয়ে উঠত। পুকুরের চকচকে মুক্তোর মত জল সূর্যাস্তের সময় সোনালী দেখাত, আরও চকচক করত। বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়োগুলোর ওপর কত রকমের রঙ খেলত! ছোট্ট মেয়ে পুকুর ধারে সবুজ ঘাসের ওপর সাদা পাথরে বসে পরীদের মত গান গাইত। হাঁসগুলো তাকে ঘিরে বসে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকত মুগ্ধ হয়ে। তারাও তার সঙ্গে সোনালী রেশমী পাখা ছড়িয়ে দিয়ে নাচত।



তারপর আকাশে চাঁদ উঠলে চাঁদের আলোয় পাহাড়ের চূড়োয় জমা বরফ রূপোর মত দেখাত। হাঁসের ঝাঁক তখন ঘরে ফেরবার জন্যে তৈরি হত।

এমনি করে শরৎকাল শেষ হল। দিনগুলো আনন্দে কাটল।

তারপর একদিন সেই ছোট মেয়েটির নিজের বাড়ী ফেরার দিন এসে গেল। সে চলে গেল।

মেয়েটি চলে যাওয়ায় বুড়ির মনে খুব কষ্ট হল, এমন কি হাঁসগুলোও তার অভাবে মনমরা হয়ে পড়ল। তারা খাওয়া ছেড়ে দিল, নাচ, গান, খেলা সবই ভুলে গেল। তারা সব সময় পুকুর ধারের সেই সাদা পাথরটিকে ঘিরে বসে থাকত, আর ভাবত সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা; তার সেই মিষ্টি গলায় মিষ্টি গানের কথা। তার নাচের কথা।

মনের কষ্টে বুড়ির অনেকদিন এইভাবে কাটল। তাকে সাহায্য করবার আর কেউই নেই। রান্না করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার করা এ সব কাজই তাকে একা একা করতে হত। হাঁসগুলোর দেখাশুনাও তাকেই করতে হতো।

বুড়ো মানুষ, এত কাজ একা হাতে করা তার পক্ষে বড় কঠিন হল। কাজ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। তাই সে মনে মনে ভাবল আর একটি মেয়ে খুঁজতে হবে যে শ্বেতপাথরের পুতুলের মত সুন্দর মিষ্টি হবে, সেই রকমই গান গাইবে, তাকে কাজে সাহায্য করবে আর হাঁসগুলোকে পুকুরে সাঁতার কাটাতে নিয়ে যাবে। বুড়ি রোজই ভাবে 'কাল যাব' কিন্তু যাওয়া হয়ে আর ওঠে না। এই ভাবে কিছুদিন আরও গেল।

এবার হাঁসগুলি রোগা হয়ে যেতে লাগল ভালমত যত্ন না পেয়ে। এ দেখে বুড়ির মনে খুব কষ্ট হল। তাই আর আলসেমি না করে একদিন সে ভোরবেলা বাড়ি থেকে বের হল একটি ভাল মেয়ের খোঁজ করতে।

যেতে যেতে জঙ্গলের ধারে পথের ওপর তার দেখা হল এক ভালুকের সঙ্গে। ভালুক তাকে নমস্কার করে বলল, কি বুড়ি মা, এত ভোরে কোথায় চলেছ?

বুড়ি বলল—আমার হাঁসগুলোকে দেখাশোনা করবার জন্যে একটি মেয়ের দরকার, তাই খুঁজতে চলেছি।

শুনেই ভালুক চট করে বলল—ওগো তুমি বুড়ি মানুষ কোথায় কোথায় খুঁজতে যাবে? কোন চিন্তা করনা, চল আমিই তোমার হাঁসদের যত্ন আত্তি করবার ভার নেব।

—না না বাছা,—বুড়ি শিউরে উঠে বলল—আমার হাঁসগুলো বড় শান্ত, তোমার এই রকম হেঁড়ে গলা শুনে তারা ভয়েই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। তুমি আমার জন্য ভেবোনা। আর তাছাড়া এই সামান্য কাজের জন্য তুমি কেন কষ্ট করবে। এ তো একটা ছোট্ট মেয়েই করতে পারে।

এই বলে কোনরকমে বুড়ি ভালুকের অনুরোধ কাটিয়ে পালাল। আরও কিছুটা পথ চলেছে এমন সময় দেখা হল এক নেকড়ে বাঘের সঙ্গে। সে বুড়িকে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করল —বুড়ি মা আজ অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল। কী সৌভাগ্য আমার। এত ভোরে তুমি তুমি কোথায় চলেছ?

তাকেও বুড়ি সেই উত্তরই দিল—আমার হাঁস গুলো চরাবার জন্য একটি ছোট মেয়ের খোঁজে চলেছি বাছা।

—সে কি কথা? আমি থাকতে তুমি কষ্ট করবে কেন? তাছাড়া আজকাল আমারও আর কোন কাজকর্ম নেই। আমিও কাজের চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করছি। আমিই তোমার কাজ করে দেব, তোমার হাঁসদের দেখা শোনা করলে কি আমার মানহানি হবে?

বুড়ি বলল—তোমাকে কেন কষ্ট দেব বাছা?

—না না আমার আবার কষ্ট কি? তাছাড়া বুড়িমা, আমি কি তোমার পর? আর বুড়ো মানুষকে সেবা করার সুযোগ তো সহজে মেলেনা। —নেকড়ে বলল।

বুড়ি তাকে বলল—বাছা, আমার হাঁস গুলো বড় শান্তশিষ্ট, মিষ্টি সুরে কথা না বললে তারা বাঁচবে না। তুমি নিজের গলার সুর মিষ্টি করার অভ্যাস কর। তোমার কথা মিষ্টি হলে তারপর আমার ঘরে এস।

বুড়ি আবার চলতে লাগল। এমনি সারা দিন চলতে চলতে এবার সন্ধ্যা হয়ে এল। খিদে তেষ্টায় শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর সে হাঁটতে পারছে না তাছাড়া সন্ধ্যেবেলায় পথে চলার সাহসও হচ্ছেনা। বুড়ি এক ঘন বটগাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

এমন সময় এক শেয়াল বন থেকে বেরিয়ে এসে বুড়িকে দেখে নমস্কার করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—বুড়িমা আজ কোথায় চলেছ?

বুড়ি উত্তর দিল—আমার হাঁসগুলো চরাবার জন্য একটি ছোট মেয়ের খোঁজে চলেছি বাছা।

—তাহলে তো বুড়ি মা আমিই তোমার এ কাজটি করে দিতে পারি। এছাড়া আমি তোমার অন্য সব কাজও করে দেব। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাঁট দেওয়া। এই সব কাজ শেষ করে তোমার হাঁসদের চরাব। আর তোমার কি চাই, আমি তো তোমার সব কাজই করে দিতে পারব। —শেয়াল খুব মিষ্টি করে বলল।

বুড়ি খুবই চিন্তায় পড়ল। শেষ পর্যন্ত সে শেয়ালের মিষ্টি কথায় ভুলে গেল। তাকে নিজের সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে এল।

পরদিন থেকে শেয়াল ঘরের কাজকর্ম সেরে রোজই সন্ধ্যাবেলা হাঁসেদের চরাতে নিয়ে যেত পুকুর ধারে। কিন্তু যখন হাঁসগুলি নিয়ে ঘরে ফিরত তখন রোজই যেন হাঁসের সংখ্যা কম হয়ে যেত। এইভাবে চলতে চলতে একদিন এমন হল যে রাতে আর একটি হাঁসও ঘরে ফিরে এল না।

রাত অনেক হল। তবু শেয়াল হাঁসদের নিয়ে ঘরে ফিরল না দেখে বুড়ি চিন্তায় আকুল হয়ে পড়ল।

শেয়াল ফিরে এসে বলল—বুড়ি মা আজ হাঁসেরা ঘরে ফিরতে রাজি হলনা।

বুড়ি জিজ্ঞাসা করল— কেন?

—কে জানে কেন তারা বাড়ি ফিরতে চায় না। বোধহয় তারা রাগ করেছে—শেয়াল বলল।

বুড়ির বড় আশ্চর্য মনে হল। তার হাতে একটা মাখনের বাটি ছিল। রান্না ঘরের দোরের কাছেই বাটিটা নামিয়ে রেখে বুড়ি পুকুরের দিকে দৌড়ে গেল।

ধূর্ত শেয়াল বুঝে গেল যে আসল কথাটা এবার বুড়ি জানতেই পারবে, আর এখানে থাকা চলবে না। তার মাখনের লোভ ছিল, তাই ভাবল তাড়াতাড়ি মাখন চেটে খেয়ে নিয়ে তারপর পালাবে। আর এমন সময় দোরে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেল শেয়ালটা।

—আমি আবার ফিরে এসেছি বুড়িমা—সেই শ্বেতপাথরের পুতুলের মত সুন্দর মিষ্টি ছোট্ট মেয়েটি ঘরে ঢুকল।

মেয়েটিকে দেখেই শেয়াল ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে যাচ্ছিল। কিন্তু মাখনের বাটিটা দেখেই সে শেয়ালটার চালাকি ধরে ফেলল। এবার মেয়েটি তার পালাবার পথ বন্ধ করে দাঁড়াল।

আর ঠিক সেই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়ি এসে বলল—হাঁস কোথায়? ঝিলের ধারে তো কেবল তাদের হাড় কখানি পড়ে আছে।

শেয়াল ধরা পড়ে গিয়ে কোন কথাই আর বলতে পারল না। এবার বুড়ির চোখ পড়ল সেই আধ-খাওয়া মাখনের বাটির উপর। রাগের চোটে বুড়ি

সেই মাখনের বাটিটা শেয়ালের মাথার উপর ছুঁড়ে মারল।

চালাক শেয়াল জানলা দিয়ে পালিয়ে গেল। মাখনের বাটিটা তার মাথায় না লেগে লাগল ল্যাজের উপর। সেই মাখন লেগে ল্যাজের উপর সাদা ছোপ পড়ে গেল।

আর সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন হিসেবে শেয়ালদের ল্যাজে সাদা ছোপ লেগে আছে।

যা হবার তা তো হল। কিন্তু এবার আবার সেই ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটি ফিরে আসাতে বুড়ি সব দুঃখ ভুলে গেল। সে আবার হাঁসেদের ছোট ছোট ছানা নিয়ে এল, আর তাদের খুব যত্ন করে পালন করতে লাগল। এবার হাঁসেদের চরবার জন্য বুড়ি একটা ঘেরা বাগান তৈরি করাল। তারপর সেই আগের মতই পুকুরপাড়ে পরীদের গানের মত গান শোনা যেতে লাগল।

পাখিদের ভাষা

সোভিয়েত রাশিয়া

সমুদ্রের ধারে একটা সহরে থাকত এক ধনী ব্যবসায়ী। তার দুই ছেলে ছিল—উইসলী আর ইভান।

বড় ছেলে উইসলী ছিল খুব চালাক। আর ইভান ছিল সাদাসিধে সরল স্বভাবের। তার আরও গুণ ছিল, সে ছিল ভারি দয়ালু আর পরিশ্রমী।

উইসলী বড়। তারই ওপর তার ব্যবসায়ী বাপের বেশী টান ছিল। তার বিশ্বাস ছিল এই বড় ছেলেই ভবিষ্যতে একদিন তার ব্যবসাবাণিজ্য দেখাশোনা করতে সক্ষম হবে। ইভানের উপর তার বিশেষ ভরসা ছিল না। ইভানকে সব সময়ে বকুনি খেতে হত বাবার কাছে। কারণ বাবার বিশ্বাস ছিল ইভান নির্বোধ। আর এই জন্য বাবা তার সব কথাতেই চটে যেত।

বেচারা ইভান আর কি করবে, সে চুপচাপ সমস্ত অন্যায় সহ্য করে যেত।

একবার ব্যবসায়ী তার দুই ছেলেকেই কাছে ডেকে তাদের ব্যবসা করবার জন্য শহরের বাইরে যেতে বলল। ব্যবসার মূলধন হিসাবে উইসলীকে দেওয়া হল দশটি স্বর্ণমুদ্রা আর ইভান পেল কেবলমাত্র দুটি স্বর্ণমুদ্রা।



দু ভাই যাত্রা করল। দুজন দুদিকে গেল। বাবার আদেশ ছিল এক সপ্তাহের মধ্যে দুজনকে বাড়ি ফিরে আসতে হবে।

উইসলী গেল এক মেলায়। সেখানে তার দেখা হল এক বন্ধুর সংগে। বন্ধুর সংগে ফুর্তি করতে সেই দশটি স্বর্ণমুদ্রাই খরচ হয়ে গেল।

আর এদিকে ভালমানুষ ইভান দু তিন দিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। কোথায় যাবে, কি করবে তা সে কিছুই বুঝতে পারল না। একদিন জংগলের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে তার দেখা হল এক কাঠুরিয়ার সঙ্গে। ইভান সেই কাঠুরিয়ার সঙ্গেই চলতে লাগল।

সে রাত্রে খুব ঝড় উঠল, আর সেই ঝড়ে একটা পাখির বাসা গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। সেই বাসায় একটা পাখির বাচ্চা ছিল। ইভান খুব যত্ন করে পাখির বাচ্চাটা তুলে বাসাটা আবার ভাল করে গাছে লাগিয়ে তাতে বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিল।

মা-পাখি দূরে বসে বসে ইভানের এই কাজ দেখছিল। ঝড় থেমে যেতেই পাখি ইভানের কাছে এসে বলল—বাছা, তোমার বড় দয়ার প্রাণ, আজ তুমি আমার বাচ্চাটার জীবন রক্ষা করেছ। বল তোমার কি চাই?

পাখির মুখে মানুষের মত কথা শুনে ইভানের খুব আশ্চর্য মনে হল। পাখি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করল—তোমার কি চাই? এবার ইভান উত্তর দিল—আমার তো কিছুই চাই না। আমি নিজের কর্তব্য করেছি মাত্র।

উত্তর শোনার পরও পাখি তাকে কিছু চাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগল। অবশেষে ইভানকে রাজি হতে হল। সে বলল—তুমি আমায় যখন কিছু না দিয়ে ছাড়বে না তখন এক কাজ কর। তোমার কথা কি মিষ্টি। তুমি আমাকে পাখির ভাষা শিখিয়ে দাও।

পাখি দুচার দিনের মধ্যেই ইভানকে তাদের ভাষা শিখিয়ে দিল, আর ইতিমধ্যে এক সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ায় দুই ভাই বাড়ি ফিরে এল।

ব্যবসায়ী খুব ব্যগ্র হয়ে উইসলীকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কত টাকা উপার্জ্জন করেছ উইসলী?

—বাবা, আমি মেলায় গিয়েছিলাম। সেইখানেই একটা বেশ লাভজনক ব্যবসায়ে আমার মূলধন নিয়োগ করেছি। পরে তা থেকে খুব লাভ হবে—উইসলী মিথ্যে বলল।

বাবা বড় ছেলের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হল। তারপর ছোট ছেলে ইভানের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি ব্যবসা করলে?

ইভান কিছুই না বলে বাবার দেওয়া সেই স্বর্ণমুদ্রা দুটি তার হাতে ফিরিয়ে দিল।

তার বাবা বেশ রাগ করে জিজ্ঞাসা করল—এই সাতদিন ধরে তুমি কি করছিলে?

—আমি জংগলে গিয়ে পাখির ভাষা শিখে এসেছি।

তার বাবা হেসে উঠল। বলল—তুমি সত্যি বড়ই বোকা ছেলে। পাখির ভাষা কি মানুষে কখনও শিখতে-বুঝতে পারে?

বাবার কথা শুনে ইভান একটি কথাও না বলে চুপ করে রইল।

সেই সময় ব্যবসায়ীর দৃষ্টি গেল কয়েকটা পাখির ওপর। পাখিগুলো দেওয়ালের ওপর বসে বসে কিচির মিচির করছিল। একটু ভেবে ব্যবসায়ী ইভানকে বলল—আচ্ছা তুমি তো পাখির ভাষা বুঝতে শিখেছ বললে, তাহলে আমায় বলোত সামনের দেওয়ালে ঐ পাখিগুলো বসে বসে কি বলছে?

ইভান বেশ মন দিয়ে পাখিদের কথাগুলো শুনল। তারপর বাবার দিকে চেয়ে বলল—এরা যা বলছে তা আমি আপনাকে বলতে সাহস পাচ্ছি না।



ছেলের কথা শুনে ব্যবসায়ী আরও রেগে গেল। ইভানের কানটা মলে দিয়ে বলল—তুমি পাখির ভাষা বুঝতে পার বলছিলে, তাহলে এখন পাখি কি বলছে বলতে পারছ না কেন? পাজি ছেলে, আমায় মিথ্যে কথা বলছিলে?

ইভান বেচারা ভয়ে কাঁপতে লাগল।

সে আর কোন উপায় না দেখে সত্যি কথা বলল—পাখিরা বলছে, যে লোক অন্যায় করে সে একদিন ভিখারী হবে। যে লোক অলস, কাজ করতে যে ভয় পায়, মিথ্যে কথা বলে সে একদিন ঘোড়ার সহিস হবে। পাখিরা বলছে, যে মানুষ সরল, সত্যবাদী সে একদিন রাজা হবে।

ইভানের কথা শেষ হতে না হতেই বাবা রেগে উঠে তাকে খুব জোরে এক চড় মারল—মূর্খ, তুমি আমাকে ভিখারী আর ঘোড়ার সহিস বলছ, আর নিজেকে সাদাসিধে, সরল সত্যবাদী বলে রাজা হবে বলছ? বাইরে গিয়ে তুমি এই সব খারাপ কথা বলতে শিখে এসেছ? রাগে জ্ঞানহারা হয়ে ব্যবসায়ী তাকে এত মারধোর করল যে সে মাটিতে পড়ে গেল।

এর কিছুদিন পরে ব্যবসায়ী দুই ছেলেকেই তার এক ধনী ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছে পাঠাল। সেই সঙ্গে বন্ধুকে এক চিঠি লিখে জানাল—আমার বড় ছেলে উইসলী বেশ বুদ্ধিমান আর কাজের, তাকে তুমি কোন ভাল কাজে লাগিয়ে দিও। কিন্তু ছোট ছেলে ইভান বড় মূর্খ আর নির্বোধ। তাকে যা হোক একটা কাজ দিয়ে দিয়ো। তার পক্ষে বাসন মাজার কাজও যথেষ্ট।

চিঠি নিয়ে দুই ভাই সেই ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে হাজির হল।

চিঠি পড়ে ব্যবসায়ী দুজনকেই বেশ ভাল করে দেখল, কিন্তু তাদের মধ্যে কে বুদ্ধিমান আর কোন জন নির্বোধ তা সে দেখে বুঝতে পারল না। তাই ঠিক করল পরীক্ষা করে দেখাই ভালো। ব্যবসায়ী তাদের দুজনকে বলল—সামনে ঐ যে সোনালী পাহাড় দেখছ সেই পাহাড় থেকে মাটি খুঁড়ে নিয়ে আসতে হবে তোমাদের। যে অল্প সময়ের মধ্যে বেশী মাটি আনতে পারবে তাকে আমি পুরস্কার দেব।

শুনে দু ভাই কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে পাহাড়ে চড়ল। পাহাড়ের মাটি খুব শক্ত। আর সেই শক্ত মাটির মধ্যে কোন কোন জায়গায় গর্ত ছিল। সেই গর্তগুলোর মধ্যে অনেক পাখির বাসা ছিল।

উইসলী কোদাল চালাতে আরম্ভ করল সেই গর্ত-গুলোর ওপর। কারণ সেখানে কোদাল চালানো সুবিধা ছিল। কোদালের আঘাতে পাখিদের বাসা-গুলো নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। বাসা ভেঙ্গে যাচ্ছে দেখে পাখিরা ভয়ে রাগে কিচির মিচির করে উঠতে লাগল।

—উইসলী, পাখিদের বাসা ভেঙ্গে দিও না। তারা কি বলছে জান? বলছে আমাদের বাসা যে ভাঙবে তার ভয়ানক ক্ষতি হবে—ইভান চিৎকার করে দাদাকে সাবধান করতে গেল।

কিন্তু উইসলী তার কথা শোনবার পাত্র নয়—সে বলল—আবার তুমি পাগলের মত যা তা বলছ? ইভান আর কি করে, সে চুপ করে গেল। আর উইসলী পাখিদের বাসাগুলো কোদাল চালিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে মাটি কাটতে লাগল।

মাটি কাটা হলে সে ঝুড়ি ভরে সেই মাটি ব্যব-সায়ীর বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় সমস্ত পাখি মিলে একসঙ্গে উইসলীর ওপর আক্রমণ করল।

হঠাৎ এরকম আক্রমণে উইসলী ঘাবড়ে গেল। তার পা পিছলে গেল। সে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। ইভান ছুটে তাকে ধরে ফেলল। উইসলীর প্রাণ তো বাঁচল কিন্তু তার ঝুড়িটা পাহাড়ের তলায় গড়িয়ে পড়ে গেল।

কি আর করবে, দুজনে পাহাড় থেকে নেমে ফিরে চলল। ইভানের হাতে মাটির ঝুড়ি আর উইসলী তার পেছনে মাথা নীচু করে হাঁটছিল।

খানিকটা পথ যাবার পর উইসলী সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে বলল—ইভান এত বোঝা নিয়ে এতখানি পথ চলাতে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। দাও, এবার তোমার ঝুড়িটা আমি বয়ে নিয়ে যাই। তুমি এইখানেই একটু বিশ্রাম কর।

ইভান ছোটখাট, রোগা পাতলা মানুষ। সে উইসলীর কথা শুনে রাজি হল। সারাদিনের পরিশ্রমে সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বসতে না বসতেই ইভান সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর ঘুম। উইসলী দেখল এই ঠিক সুযোগ। সে চট করে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে ব্যবসায়ীর বাড়ীর পথ ধরে রওনা হল। ইভান সেইখানেই পথের ওপর ঘুমিয়ে রইল।

ব্যবসায়ীর বাড়ী পৌঁছে উইসলী তাকে বলল—ইভান বড় অলস। সে নিজের ঝুড়ি কোদাল ফেলে রেখে পাহাড়েই ঘুমিয়ে আছে।

ব্যবসায়ী ভাবল ইভানের বাবা সত্যি কথাই লিখেছেন। ইভান ছেলেটা একেবারেই মূর্খ আর অলস।

রাত হল, ইভানের ঘুম ভাঙল। সে ব্যবসায়ীর বাড়ীর দিকে রওনা হল। ইভানকে দেখে ব্যবসায়ী রেগে গিয়ে মারধোর করল। তারপর তাকে কিছু খেতে না দিয়ে সেই রাতেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

ইভান সারারাত বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগল।

পরদিন ইভান খবর পেল একটা জাহাজ সমুদ্র যাত্রা করছে। সে গিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে জাহাজে একটা কাজ পেল—বাসন মাজার কাজ।

ইভান সেই জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল। এমন সময় দেখে উইসলী সেই জাহাজে। উইসলীর গায়ে সুন্দর দামী পোষাক। ইভান তাকে দেখে আশ্চর্য হল। সে জিজ্ঞাসা করল—উইসলী তুমি এখানে? আমি তো সারা রাত তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম। ব্যবসায়ী আমায় খুব মেরেছিল কাল রাতে। আমার ভয় হচ্ছিল তোমাকেও বোধহয় সে মেরেছে।

উইসলী বলল— কপালে থাকলে সবই হয়। ব্যবসায়ী আমায় মোটেই মারেনি। বরং আমার যোগ্যতায় খুশী হয়ে আমাকে এই জাহাজের ক্যাপ্টেন করে দিয়েছে।

—কিন্তু জাহাজের ব্যাপারে তুমি তো কিছুই জান না উইসলী, তাহলে কি করবে? ইভান বলল।

উইসলী তার কথার কোন উত্তর দিল না বরং রেগে মুখখানা গোমড়া করে সেখান থেকে সরে গেল।

জাহাজ ছাড়বার সময় হল। এমন সময় জাহাজের প্রধান ক্যাপ্টেন উইসলীর কাছে এসে আবহাওয়ার অবস্থা জানতে চাইল। উইসলী আবহাওয়ার বিষয়ে কিছুই বুঝত না। কিন্তু সে নিজের অজ্ঞানতা প্রকাশ করবে কেন? তাই সে বেশ বিজ্ঞের মত বলল—জাহাজ ছেড়ে দিন, আবহাওয়া ঠিক আছে।

জাহাজ ছাড়ছে এমন সময় ইভান দৌড়তে দৌড়তে উইসলীর কাছে এসে বলল—উইসলী, জাহাজ এখন ছাড়া ঠিক হবে না। ঝড় আসছে, আমি এখনই আকাশে ওড়া পাখিদের এই কথা বলতে শুনে এলাম।

কিন্তু উইসলী তার কথায় কানই দিল না, ভাইকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিল।

জাহাজ তো ছেড়ে দিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ংকর ঝড় তুফান উঠল। জাহাজ ডুবে যায় যায়। খুব কষ্টে প্রধান ক্যাপ্টেন জাহাজটাকে ঝড় তুফানের হাত থেকে বাঁচাল।

ইভান যখন উইসলীকে পাখিদের কাছে শোনা ঝড়ের সম্ভাবনার কথা বলেছিল তখন প্রধান ক্যাপ্টেন সেইখানেই ছিলেন। এখন সেই কথাটা

তাঁর মনে পড়ল। তিনি ইভানকে ডেকে তখনই উইসলীর জায়গায় নিযুক্ত করলেন, আর উইসলীকে দিলেন বাসন মাজার কাজ।

ইভানের বুদ্ধি বিবেচনার ফলে এবার জাহাজের যাত্রা খুবই সফল হল। যাত্রীরা নিরাপদে ও ভাল-ভাবে ভিন দেশে পৌঁছে গেল। ব্যবসা বাণিজ্যের কাজও খুব ভাল হল। প্রধান ক্যাপ্টেন ভারি খুশী। তিনি ইভানকে কিছু সোনা দানা উপহার দিলেন।

সে দেশটি ইভানের বড় পছন্দ হল। সে ঠিক করল সেই দেশেই সে থেকে যাবে।

উইসলীও সেই দেশে ইভানের সঙ্গে বাস করতে লাগল। কিন্তু তার মনে সুখ ছিল না।

সেই নতুন দেশে খুব কাকের উপদ্রব। তাদের উৎপাতে রাজা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। চব্বিশ ঘন্টা রাজমহলের দেওয়ালে, ছাতে, আলসেতে, গাছের উপর কাকের কা কা রব। অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে দিনে রাতে এক দণ্ডও রাজা ঘুমোতে পান না কাকের চিৎকারে। তাদের তাড়াবার জন্যে অনেক রকম চেষ্টা হল। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হল না। এদিকে অশান্তি আর অনিদ্রায় রাজা অসুখে পড়লেন।

আর কোন উপায় না দেখে অবশেষে তিতিবিরক্ত রাজা ঘোষণা করে দিলেন—যে তাঁকে কাকের এই উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব দেবেন, আর রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন।

উইসলী এই ঘোষণা শুনে চটপট কাক তাড়াবার উপায় বের করে ফেলল।

সে সহরের সমস্ত বেড়াল ধরে আনল। তাদের বন্ধ করে রাখল, আর কয়েকদিন তাদের কিছুই খেতে দিল না। তারপর সেই ক্ষুধার্ত বেড়ালগুলোকে এনে রাজমহলে ছেড়ে দিল।

ছাড়া পেতেই বেড়ালগুলো কাকগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেকগুলি কাক বেড়ালদের পেটে গেল, বাকি কাকগুলো সেখান থেকে উড়ে পালিয়ে গেল।

রাজা কাকেদের উৎপাত থেকে মুক্তি পেয়ে উইসলীর ওপর খুব খুশী। তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন, রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন, তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। এমন সময় একদিন আবার অসংখ্য কাক রাজমহলে এসে হাজির। সারা আকাশ জুড়ে কাক আর কাক। হাজার হাজার কাক বেড়ালগুলির উপর বাজ পাখির মত ছোঁ মেরে তাদের ছিঁড়ে আঁচড়ে কামড়ে মেরে ফেলল। সেদিন থেকে আবার শুরু হল কাকদের সেই চিৎকার। এবার তাদের চিৎকার আগের চেয়ে ঢের বেড়ে গেল।

রাজা তো রেগে আগুন, কিন্তু কাকের উপর রাগ করে আর কি করতে পারেন? অন্য কাউকে চাই ঝাল মেটাবার জন্য। তাই রাজার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল উইসলীর ওপর।

রাজা উইসলীর ফাঁসীর হুকুম দিলেন।

রাজা ভাইএর ফাঁসীর হুকুম দিয়েছেন শুনে ইভান তখনই দৌড়তে দৌড়তে রাজার সামনে হাজির হল। তাঁর সামনে দুটি হাত জোড় করে বলল—মহারাজ, আপনি আমার ভাইকে দয়া করে রক্ষা করুন। কাকের উপদ্রব থেকে আমি আপনাকে রক্ষা করব।

রাজা ইভানের শর্তে রাজি হলেন।

ইভান পাখির ভাষা জানে। সে খুব মন দিয়ে কাকেদের কা কা চিৎকারের মানে বোঝবার চেষ্টা করল। তারা কা কা করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে নিজেদের অভিযোগের কথা। রাজাকে তারা তাদের কষ্টের কথাগুলি চিৎকার করে বলছে। রাজা তো আর পাখির ভাষা বোঝেন না। সুতরাং তিনি কাকেদের চিৎকারটাকে অনর্থক উৎপাত বলে মনে করছেন।

ইভান রাজাকে কাকেদের দুঃখ কষ্টের কথা বুঝিয়ে বলে। ইভানের কথা শুনে রাজা তখনই

কাকদের অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্য হুকুম দিলেন। কাকেরা খুশী হয়ে রাজমহল থেকে চলে গেল। রাজা শান্তি পেলেন, তাঁর ঘুমেরও আর কোন বাধা রইল না।

ইভান কেবল অর্দ্ধেক রাজত্বই নয়, সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যাকেও পেল। তাদের খুব ঘটা করে বিয়ে হল।

উইসলীর ফাঁসীর সাজা রদ হয়ে গেল। কিন্তু সে রাজ্যের নিয়ম ছিল ফাঁসীর সাজা থেকে রক্ষা পাওয়া অপরাধীকে সারা জীবন রাজমহলের বাইরে ঘোড়ার আস্তাবলের সহিস হয়ে থাকতে হবে। উইসলী তাই ঘোড়ার সহিস হল।

এইভাবে কয়েক বছর কেটে গেল, ইভান খুব সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগল। একদিন ইভান রাণীকে নিয়ে শিকার করতে গেল। জঙ্গলের কাছে এক বুড়ো ভিখারীকে দেখল ইভান। সে গান গেয়ে ভিক্ষা করছিল। তার গানের কথাগুলি ছিল এই রকম—পাখির কথা নিশ্চয় ফলে, আমি তো তাদের কথা মত ভিখারী হয়ে গেলাম, কিন্তু আমার ইভান তো রাজা হল না!

তার এই অদ্ভুত গান শুনে ইভান দাঁড়িয়ে পড়ল। তার কাছে এসে তাকে ভাল করে দেখতে লাগল। বাবাকে চিনতে দেরী হল না। ইভান তার পায়ে পড়ে বলল—বাবা পাখির কথা মিথ্যা হবার নয়। আমিই তোমার ছেলে ইভান।

বুড়ো বাপ ইভানকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

বা খো

ভিয়েতনাম

এক গ্রামে এক গরীব বুড়ি থাকত। তার একটি ছেলে ছিল—নাম তার বা খো। খুবই বুদ্ধিমান আর শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল বা খো। সে কখনও কারো ক্ষতি করত না, সবার সঙ্গে বন্ধুর মত মিষ্টি করে কথা বলত। সকলের সঙ্গে খেলা করত। ঝগড়া ঝাঁটি তার একেবারে ভাল লাগত না। নিজের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে ক্ষেতের কাজে সাহায্য করত। ক্ষেতে যা জন্মাত তাতেই সন্তুষ্ট থাকত।

সে দেশে একটা ভয়ানক রাক্ষস ছিল। লোকের মনে সেজন্য সব সময় একটা দারুন আতঙ্ক ছিল। সেই রাক্ষসটার ছিল চারটে মুখ আর পাঁচটা নাক। পাহাড়ের মত প্রকান্ড তার শরীরটা। গায়ের রং কালো কুচকুচে। মুলো গাজরের মত একসঙ্গে চারটে লোককে সে তার চারটে মুখ দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত।

রাক্ষসের ভয়ে রাজ্যে ত্রাহি ত্রাহি পড়ে গেল। তার নাম শুনলে লোকে ভয়ে কেঁপে সারা হত। দেশের লোককে সেই দুষ্টু রাক্ষসের হুকুমে চলতে হত। কারও এমন সাহস ছিল না যে তাকে অগ্রাহ্য করে। ক্রমে ক্রমে সেই রাক্ষস কত গ্রাম, কত সহর যে জনশূন্য করে দিল তার আর হিসেব নেই। রাজা রাজ্য ছেড়ে পালাল। বহু লোক দেশ ছেড়ে পালাল। বেচারা বা খো গরীব। সে তার মাকে নিয়ে কোথায় আর যায়, সে গ্রামেই রয়ে গেল

একদিন বা খো জানতে পারল রাক্ষসের কাছে খাবার হয়ে এবার তারই যাবার পালা আসছে। তার বুড়ি মা এ খবর পেয়ে কেঁদে আকুল। তার একটি মাত্র ছেলে, তাকে সে রাক্ষসের মুখে পাঠাবে কেমন করে। বা খোও কম সাহসী ছিল না। মার ইচ্ছা ছেলের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে নিজে রাক্ষসের কাছে যাবে। কিন্তু বা খো তাতে রাজি হবার মত ছেলে ছিল না। মা অনেক করে ছেলেকে বোঝাতে লাগল। কিন্তু বা খো মাকে বলল—মা, ছেলের কর্তব্য মা বাবার সেবা যত্ন করা, তাদের সুখে রাখা। এ রকম না করা ছেলের পক্ষে পাপ। নিজের প্রাণ বাঁচাবার লোভে তোমায় আমি রাক্ষসের কবলে পাঠাব এ কখনও হতে পারে না। আমিই যাব আর সেই রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই করব।

আশ্চর্য হয়ে মা বলল—ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষসের সঙ্গে তুমি কেমন করে লড়বে বাবা?

বা খো বলল—যেভাবে লড়াই করা দরকার আমি সেই ভাবেই লড়ব।

বুড়ি ছেলেকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করল। বলল, সে রাক্ষস বড় ভয়ঙ্কর আর তার গায়ে প্রচন্ড জোর। আর তুমি তো বাচ্চা ছেলে। তুমি একা কেমন করে ঐ রাক্ষসের সঙ্গে লড়বে বাবা?

—তোমার বা খো কেবল সেই রাক্ষসের সঙ্গে লড়বে কেন মা। সারা দেশের বা খো রা যদি দল বাঁধে, তাহলে সে দল ঐ রকম হাজারটা রাক্ষসের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের মেরে ফেলতে পারে। তুমি ভেবে দেখ আমি ঠিক কথা বলছি কি না। মা, মানুষ নিজেই তার নিজের বড় সহায়। আমি নিজেই রাক্ষসকে মারবার উপায় করব। আর যদি ভালো করে চেষ্টা করি তাহলে আমার জয় হবেই।

ছোট্ট ছেলে বা খো র মুখে এই রকম সাহসের কথা মায়ের মনে গেঁথে গেল। এমন সাহসী বুদ্ধিমান নির্ভীক ছেলে তার। মায়ের চোখে জল এল ছেলের গর্বে। সে আর বা খোকে বাধা দিল না।



বিদায় দেবার সময় ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর আশীর্বাদ করে মা বলল—তবে তুমি যাও বাবা। ভগবান তোমার সহায় হবেন। তোমায় পথ দেখাবেন। যত বিপদই আসুক না কেন কখনও নিরাশ হয়ো না, সাহস হারিও না। যারা সাহসের সঙ্গে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ে, ভগবান তাদের সহায়।

বাখো মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে রওনা হল।

যেতে যেতে সে একটা চৌরাস্তার মোড়ে বসে নিজের ছুরিটায় শান দিতে লাগল একটা পাথরের উপর ঘসে ঘসে। পথ চলতি লোকেরা তাকে দাঁড়িয়ে দেখে যাচ্ছিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করছিল---বাখো, এ তুমি কি করছ? ছুরিটায় তো তোমার খুবই ধার, আর ওটাকে বেশী ধার করছ কেন?

বাখো একটু হেসে সবাইকেই এক উওর দিল—ছুরিটাকে শান দিয়ে বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ ঝকঝকে করছি।

উৎসুক লোকে জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু কেন?

—রাক্ষসটাকে মারবার জন্যে। আপনারা কেউ আমাকে সাহায্য করবেন?

—ওরে বাপরে, রাক্ষস এ কথা শুনলে তো আর রক্ষা নেই, সে আমাদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। এমন পাগলের মত কথা মুখেও এনো না বাখো। লোকেরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

বেচারা বাখোকে কেউ সাহায্য করতে এল না।

কিন্তু বাখোর মনের জোর একটুও কম হল না।

সে লোকালয় ছেড়ে গভীর জঙ্গলের দিকে যাত্রা করল। জঙ্গলে দেখা হল সাপেদের রাজার সঙ্গে। বাখো নিজের বিপদের কাহিনী তাকে শোনাল। এমন যে ভয়ানক বিষাক্ত সাপ তারও এই কাহিনী শুনে কষ্ট হল, দয়া হল। সে বাখোকে বলল—,

আমার সমস্ত সর্পসেনা তোমায় সাহায্য করবে বা খো।

এবার বা খো আরও এগিয়ে গেল। এবার দেখা হল বিষাক্ত বিছেদের রাজার সঙ্গে। বা খো বিছে রাজাকেও তার কাহিনী শোনাল। বিছেরাজও তাকে সাহায্য করতে রাজী হল।

তারপর তার দেখা হল বোলতা রাজার সঙ্গে, পিঁপড়েদের রাণীর সঙ্গে, শেয়াল রাজার সঙ্গে, নেকড়ে রাজার সঙ্গে। বা খোর রাক্ষস মারার সংকল্প শুনে সকলে সৈন্য দিয়ে বা খোকে সাহায্য করবে বলে কথা দিল।

এবার বা খো লোকালয়ের জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে দেখা করল, তাদের সব কথা বলল, আর রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে তাকে সাহায্য করবার অনুরোধ জানাল। গরু মোষ, শুয়োর, গাধা, উট, হাতি সবাই বা খোকে সাহায্য করতে চায়। ক্ষেতের লাল লঙ্কা রাণী, বা খোর কাছে রাক্ষসের অন্যায় অত্যাচারের কাহিনী শুনে রেগে আরও লাল হয়ে গেল। পাশেই ছিল কুমড়ো লতা। লঙ্কারাণী তার কানে কানে বলল—বা খোকে আমাদের সকলেরই উচিত যথাসাধ্য সাহায্য করা। কুমড়ো লতা নিজের নরম নরম ডগা নেড়ে লঙ্কারাণীর কথায় সায় দিল। ক্ষেতের মুলো, বেগুন, গাজর, মটর, টোমাটো সকলেই নিজের নিজের দল বল নিয়ে বা খোকে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্য করবে ঠিক করল। সকলে মিলে প্রস্তুত হতে লাগল।

তারপর সেই বিশেষ দিনটি এল যেদিন বা খোর রাক্ষসের কাছে যাবার পালা। এবার তাকে লড়তে হবে।

ভোর বেলা মুরগী সর্দার ককুর-কু ডাক দিয়ে সকলকে ঘুম থেকে জাগাল। জঙ্গলে শেয়ালদের হুক্কা হুয়ায় যুদ্ধের বিউগলের ধ্বনি বেজে উঠল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজ সমস্ত জঙ্গলে শোনা যেতে লাগল, যেন যুদ্ধে ঝাঁজর বাজছে। আর সেই সব শুনে একটুও দেরি না করে সবার সেনাদল তৈরি হল বা খোর সঙ্গে রাক্ষসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য।

সেনাপতি বা খো সবার আগে। তার হাতে বিদ্যুতের মত চকচকে ধারালো ছুরি। তার পেছনে বোলতা সেনার দল, ফণা উঁচু করে লকলকে জিভ বার করতে করতে সাপের সেনা দল। বিছেদের সেনা দলও সার বেঁধে চলতে লাগল। তাদের পেছনে মার্চ করতে করতে শেয়ালের দল। তারপর যুদ্ধের রসদ পিঠে নিয়ে গাধা আর খচ্চরদের সারি। উট, হাতিরা সারি বেঁধে চলতে লাগল। তাদের পিঠে চড়ে কুমড়ো, লাউ, লঙ্কা, মুলো, গাজর, বেগুন সবাই চলল রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

বেলা দুপুর হল। জনশূন্য রাজধানীর চওড়া রাস্তায় সেই শক্তিশালী সৈন্যদল এগিয়ে যেতে লাগল। মেয়েরা তাদের উপর ফুল ছড়াতে লাগল। যে দু'চারজন পুরুষ মানুষ তখনও রাক্ষসের কবলে পড়েনি তারা মাথা নিচু করে বা খোর সৈন্যদলকে নমস্কার করল।

সৈন্যদের এবার পাহাড়ে চড়তে হবে। সেই পাহাড়ে রাক্ষসের প্রাসাদ।

কিছুদূর গিয়ে তাদের দাঁড়িয়ে পড়তে হল, সামনে খরস্রোতা গভীর গাঙ। সে নদী পার হওয়া এক বড় রকমের সমস্যা। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কি করা যায়। তাদের মধ্যে কিছু সেনা ভয় পেল, কিন্তু বেশীর ভাগেরই সংকল্প কিছুতেই পিছু হটা চলবে না।

অবশেষে ঠিক হল যে নদীর উপর পুল বাঁধতে হবে। হাতিরা জঙ্গল থেকে বড় বড় গাছ উপড়ে নদীতে এনে ফেলতে লাগল। মাটি পাথর এই সব আনবার জন্যে কাজে লেগে গেল বাঁদর, শেয়াল, ভালুক, বনমানুষ সবাই মিলে। গাজর, মুলো, বেগুন সেনারা গাধা খচ্চরের পিঠে চড়ে মাটি বয়ে আনতে লাগল। কুমড়ো আর লাউএর লতারা

ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। তারা গাছগুলিকে একটার সংগে একটা মজবুত করে বেঁধে ফেলল যাতে সেগুলো আলাদা হয়ে নদীর স্রোতে বয়ে না যায়।

আর দেখতে দেখতে নদীর সেতু তৈরি। পুলকে আরো মজবুত করবার জন্যে লম্বা লম্বা সাপ জোড়ায় জোড়ায় দড়ির মত পুলটাকে বাঁধল। কিছু সাপ পুলের দুধারে রেলিংএর মত করে নিজেদের দাঁড় করাল, যাতে তাদের ধরে ধরে সৈন্যদল পুল পার হতে পারে।

তারপর সেনারা নদী পার হল সেই পুল দিয়ে। তবে পুল তৈরি করে নদী পার হতে চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। গভীর অন্ধকার রাত। সেই অন্ধকারে এবার পেঁচারা এগিয়ে গিয়ে সবাইকে পথ দেখাতে লাগল। অসংখ্য জোনাকি পথ আলো করে রইল। এইভাবে পাহাড়ের উপর পেঁছিল বা খোর পশু পাখি, সরীসৃপ আর সবজী সেনার দল। সামনে সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের কেল্লা।

কেল্লাটা ছিল যেমনি বিরাট চওড়া তেমনি উঁচু। কালো পাথরের তৈরি কেল্লা, ঠিক যেন একটা পাহাড়। উঁচু উঁচু ভারি লোহার দরজা আর সেগুলোর উপর ধারাল লোহার সিক বসানো। দরজা সব গুলোই বন্ধ। আর সেই কেল্লার মধ্যে সেই রাক্ষস খুব নিশ্চিন্ত হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

এ রকম মজবুত কেল্লা ভেঙে ভেতরে ঢোকা তো সম্ভব নয়, কিন্তু বা খোর সৈন্যদল হার মানবার মত নয়। কেউই হাত পা গুটিয়ে বসল না, নিরাশ হল না কেউ। সকলে একজোট হয়ে নিজের নিজের কাজে লেগে গেল।

লাউ কুমড়োর লতারা এক দৌড়ে কেল্লার ছাদে পেঁছে গেল। সাপেরা দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। আর সাপেদের দড়ির মত করে ধরে ধরে অনেক সৈন্য কেল্লার ছাদের ওপর চড়ল। তারা নিঃশব্দে কেল্লায় ঢুকে সমস্ত দরজা খুলে দিল।

তারপর সমস্ত সৈন্যদল অতি সহজে কেল্লার ভেতরে ঢুকে পড়ল। কোন বাধাই আর রইল না।

এবারে রাক্ষসকে আক্রমণের কাজ শুরু হলো।

রাক্ষস নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সাপেরা প্রথমে গিয়ে তাকে এমন করে কষে জড়িয়ে ধরল যে তার নড়ার ক্ষমতাও রইল না। বোলতাগুলো চারপাশ থেকে তাকে কামড়ে ধরল। তার পা দুটো বিছের কামড়ে অনড় হয়ে গেল। বড় বড় লাউ কুমড়োর দল ধমাস্ ধমাস্ করে রাক্ষসের বুকের উপর পড়তে লাগল। মুলো গাজর কেউই তাকে ছাড়ল না। লংকা রাক্ষসের চোখে ঢুকে পড়ল। এবার বা খোর পালা। বা খো রাক্ষসের বুকের উপর চড়ে বসে ছুরি দিয়ে তার গলায় পেঁাচ দিতে লাগল। হাতিরা নিজেদের থামের মত পা দিয়ে তাকে থেঁতলে দিল। যার যে রকম ক্ষমতা সে সেইভাবে রাক্ষসটাকে জখম করতে লাগল।



দেখতে দেখতে সেই পাহাড়ের মত রাক্ষস মরে পড়ে রইল।

রাক্ষস মরল। দেশে সুখ শান্তি ফিরে এল। পাখিরা মনের আনন্দে আবার গান গাইতে লাগল। গাছেরা আবার জীবন্ত সবুজ সুন্দর হয়ে গেল। গরীব কিষাণ মজুরেরা নির্ভয়ে, শান্তিতে নিজেদের ক্ষেতে ফসল ফলাতে লাগল।

দেশের মানুষের দুঃখের দিন শেষ হল।

খরগোশের শিং

কাম্পুচিয়া

অনেক কাল আগেকার গল্প। সে সময় পিঁপড়ে ছিল বেশ বড়সড়। লম্বা চওড়া আর বেশ মোটা-সোটা। অনেকটা ব্যাঙের মতো।

একবার এক কান্ড ঘটল। গভীর এক জঙ্গলে কিছু চোর বাস করত। তাদেরই আস্তানায় কিছু পিঁপড়েও ছিল। একদিন অসাবধান হওয়াতে চোরদের আস্তানায় আগুন লেগে গেল। সেই কাঠ পাতার তৈরি ঘর নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। চোরদের যা কিছু ছিল পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। তাই চোর গুলো চলে গেল আর এক জায়গায় আস্তানা গড়তে।

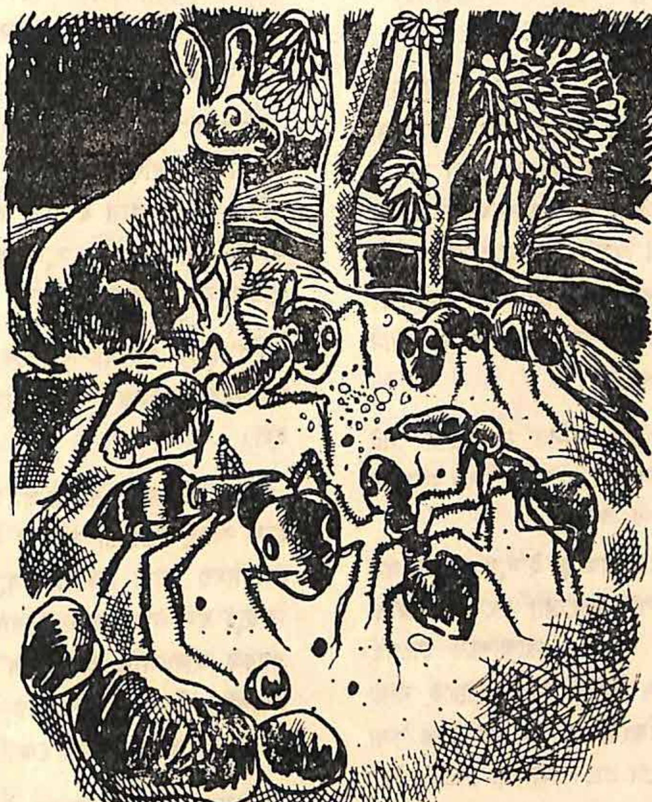
কিন্তু পিঁপড়েদের হল বিপদ। তারা ভাবতে লাগল কোথায় যাবে, কি করবে। এতদিন তো তাদের দিন কেটেছে বেশ আরামে। খাবার দাবারের ভাবনা ছিল না। জল পাওয়া যেত চোরদের ঘরে। চোরেরা অনেক কিছু চুরি করে আনত। আর তাদের সেই চুরির জিনিষ চুরি করে পিঁপড়েদেরও পেট ভরত। খুবই সুখে বিনা পরিশ্রমে তাদের দিন কাটছিল। কিন্তু এবার কি হবে?

তারা কোন কাজকর্মই শেখেনি। চোরদের সঙ্গে থেকে থেকে তাদেরও চুরি করে খাবার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিভাবে মেহনত করে খাবার জোগাড় করতে হয় জানে না। এইসব ভাবতে ভাবতে কিছু-দিন কাটল। অলস পিঁপড়েরা না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে যেতে লাগল।

একদিন তারা দেখল কাছের ঝোপের মধ্যে একটা বুড়ো খরগোশ গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে। আরামে তার নাক ডাকছে। পিঁপড়েরা নিঃশব্দে খরগোশের কাছে গিয়ে তাকে ঘিরে ফেলল। তারপর সবাই মিলে উপোসী বাঘের মত খরগোশের ওপর আক্রমণ করল। বুড়ো খরগোশের ঘুম ভাঙল, ধড়মড় করে জেগে উঠল। ব্যাপার দেখে তার তো চোখ কপালে উঠল ভয়ে। চারদিক থেকে বড় বড় পিঁপড়ে তাকে ঘিরে ধরেছে। তার রক্ত চুষছে। আর খাবলে খাবলে তার মাংস খাচ্ছে। বেচারা বুড়ো খরগোশ দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। কিন্তু তার কথা শুনবে এমন কে আর আছে। অবশেষে পিঁপড়েদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

সে পিঁপড়েদের বলল—আরে তোরা কি বোকা। আমায় যদি খেতেই হয় তাহলে আস্তে আস্তে খা। খোলা জায়গায় আগে আমায় নিয়ে চল্ ; তারপর সবাই মিলে ধীরে সুস্থে বেশ আয়েশ করে বসে আমায় খা। এইভাবে হুটপুট করে খেয়ে তোদের কি আরাম হচ্ছে। শুধু শুধু তোরা কষ্ট করে মরছিস।

মূর্খ পিঁপড়ের দল খরগোশের চালাকি বুঝতে পারল না। খরগোশের কথা মত তারা তাকে একটা খোলামেলা জায়গায় নিয়ে গেল। তাকে মাটিতে নামিয়ে রাখতেই খরগোশ দাঁড়িয়ে ঝট্ করে এক লাফ দিয়ে অনেকটা দূরে একটা পাথরের উপর চড়ে বসল। এবার পিঁপড়েরা জব্দ হয়েছে দেখে খরগোশটা হাসতে হাসতে লেজ নেড়ে বলল, কি এখনো তোরা আমায় খেতে চাস?



পিঁপড়েরা খরগোশের লাফ দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এবার রাগে গরগর করতে করতে বলল—হ্যাঁ। আমরা তোমায় খেয়ে ফেলতে চাই, আমাদের ক্ষিদে পেয়েছে। তুমি আমাদের ঠকালে। এটা কিন্তু ভাল হল না।

খরগোশ একটু ভেবে বলল—ঠিক আছে। আমি যখন তোমাদের কথা দিয়েছি তখন তোমরা আমায় খাবে। তবে আমারও একটা শর্ত আছে, তোমাদের সে শর্ত মানতে হবে।

পিঁপড়েরা বলল—তোমার শর্তটি কি বলো।

খরগোশ বলল—দেখ। এখন আমি বড় রোগা হয়ে গেছি। আমায় খেয়ে তোমাদের পেট একটুও ভরবে না। তাই বলছি কিছুদিন আমায় জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দাও। তারপর ঘাস পাতা খেয়ে আমি যখন বেশ মোটা হয়ে যাব, তখন তোমরা আমায় খেয়ো।

পিঁপড়েরা জিজ্ঞাসা করল—মোটা হতে তোমার কতদিন লাগবে?

বুড়ো খরগোশ উত্তর দিল—তা তো আমি বলতে পারব না। তবে একটা কথা ঠিক। আমি যখন মোটা হব তখন আমার শিং বার হবে। আমার মাথায় দুটো বড় বড় শিং দেখেই তোমরা বুঝবে যে আমি মোটা হয়েছি। তখন তোমরা সবাই মিলে আমায় খেয়ে ফেলবে। আমি তখন তোমাদের একটুও বাধা দেব না।

পিঁপড়েগুলো খিদের জ্বালায় মরে যাচ্ছিল। আবার বলল—কবে তুমি মোটা হবে?

—যখন তোমাদের পাখা গজাবে—এই বলে খরগোশ এবার এক লাফ দিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে পালিয়ে গেল। পিঁপড়েরা আর তাকে দেখতে পেল না। মূর্খ অলস পিঁপড়েগুলোর মুখ থেকে লালা ঝরতে লাগল। তারা চুপ করে অলস হয়ে বসে রইল সেই দিনের আশায়, যেদিন খরগোশ মোটা হবে, তার শিং গজাবে, তাদের পাখা গজাবে আর তখন তারা আরাম করে খরগোশের মাংস খাবে।

পিঁপড়েরা কাজ করতে জানত না। তাই সেই অকর্মণ্য পিঁপড়ের দল পায়ের ওপর পা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল খরগোশের জন্য।

পথ দিয়ে বাঘ, শেয়াল, নেকড়ে, ইঁদুর বেড়াল যত জন্তু জানোয়ার যেত পিঁপড়েগুলো তাদের জিজ্ঞাসা করত—ভাই তোমরা বুড়ো খরগোশকে দেখেছ কোথাও? এতদিনে সে নিশ্চয় মোটা হয়েছে, আর তার বড় বড় শিংও গজিয়েছে। সে আমাদের কথা দিয়েছে যে সে মোটা হলে তাকে আমারা খেতে পাব।

পিঁপড়েদের এই বোকার মত কথা শুনে সবাই খুব হাসত, আর কোন উত্তর না দিয়ে চলে যেত।

এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল, কিন্তু খরগোশের দেখা মিলল না। সেই জায়গাটাতেই বসে বসে উপোসী পিঁপড়েগুলো শুকিয়ে যবের দানার চেয়েও ছোট্ট হয়ে গেল। অথচ আগে তারা ব্যাঙের মত বড় বড় ছিল। তবু সেই অলস পিঁপড়েরা খাবার খোঁজবার জন্য একদিনও ঘোরাফেরা করল না। পেটের জ্বালা মেটাতে কোন কাজই করল না। তাদের মনে আশা খরগোশ নিজেই তাদের কাছে আসবে, আর তারা আরামে তাকে খাবে।

তারপর একদিন সেই ছোট্ট ছোট্ট পিঁপড়েদের পাখা গজাল। তারা হাওয়ায় একটু একটু উড়তে পারত। এবার তারা একদিন সেই বুড়ো খরগোশের দেখা পেল। দেখল বুড়ো খরগোশ একটা উঁচু টিলার ওপর বসে পিঁপড়েদের দেখছে, আর হাসছে।

খরগোশকে দেখে পিঁপড়েরা রাগে চোখ লাল করে তার দিকে দৌড়ুল। তাদের আসতে দেখে খরগোশ আরও বেশী করে হাসতে লাগল। বলল—এখনও আমার শিং গজায়নি, সুতরাং তোমরা আমায় খেতে পারবে না, তোমাদের কপাল খারাপ।

পিঁপড়েরা খরগোশের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যিই খরগোশের মাথায় শিং তো নেই, তারা বড়ই নিরাশ হল।

এবার খরগোশ নিজের হাসি থামিয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, তোমরা সত্যিই বড় অলস আর মূর্খ। তোমাদের পাখা গজাল তবু তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই হল না। এখন আমায় সত্যি করে বল দেখি এরকম আলসেমি আর মূর্খতা তোমরা কার কাছে শিখেছ। নিজে পরিশ্রম না করে অন্যদের রক্ত চুষে পেট ভরাতে তোমাদের কে শিখিয়েছে?

খরগোশের এই প্রশ্নের উত্তরে পিঁপড়েরা তাকে সত্য কথাটি জানাল। বলল—আমরা বহুদিন একটা ঘরে ছিলাম। সেখানে কয়েকজন লোক থাকত। তারা অন্যদের জিনিষপত্র চুরি করে আনত। আমরাও সে সব জিনিস থেকে চুরি করে খেয়ে বেঁচে থাকতাম।

খরগোশ বলল—ও তাই। তাই তোমরা এত মূর্খ।

পিঁপড়েরা জিজ্ঞাসা করল—কেন?

খরগোশ বলল—মূর্খরা অলস হয়, তারা কারও সৎগুণ শিখতে পারে না, কেবল মন্দগুলোই শেখে। তোমর্য়াও তাই করেছ, তাই আজ তোমাদের এই দুর্দশা।

পিঁপড়েরা খরগোশের কথা শুনে চিন্তায় পড়ে গেল।

খরগোশ তাদের বলল—দেখ, সব মানুষ খারাপ নয়। তাছাড়া প্রত্যেকেরই কিছু মন্দ দিক ও কিছু ভাল গুণ থাকে। ভাল লোকেরা তোমাদের মত, বা নির্বোধ জন্তুদের মত বাঁচে না। তারা ঘর তৈরি করে বাস করবার জন্য। মানুষ অনেক পরিশ্রম করে। তাছাড়া সমস্ত কাজই নিয়ম মত করে তারা। তারা নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকে, খাবার দাবার সবাই ভাগ করে খায়। এই সব ভাল গুণ তোমাদেরও শিখতে হবে। যখন তোমরা এই সব শিখতে পারবে তখন আর আমার মাংস খাবার দরকার হবে না। বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের খাবার জোগাড় করতে পারবে। তোমাদের যখন জ্ঞান বুদ্ধি হবে জানতে পারবে বুড়ো খরগোশের শিং গজিয়ে গেছে। এই বলে খরগোশ সেখান থেকে লাফ দিয়ে জঙ্গলে গেল।

সে চলে যাবার পর পিঁপড়েরা নিজেদের মধ্যে তার কথাগুলি নিয়ে আলোচনা করে দেখল। তারা বুঝল খরগোশ ঠিক কথা বলেছে। তারাও এবার মানুষের মত পরিশ্রম করে সকলে মিলে মিশে থাকবে।

আর সেই দিন থেকে পিঁপড়েদের নতুন জীবন আরম্ভ হল।

এখন পিঁপড়েরা মানুষের মত ঘর তৈরি করে। বড়দের কথামত চলে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে না। বরং তাদের মধ্যে খুব সদ্ভাব আছে। সবাই মিলে কাজ করতে চায় আর সবার সঙ্গে ভাগ করে খাবার খায়। তারা খুব পরিশ্রম করে খাবারের সন্ধান করে। মানুষদের মত পিঁপড়েরা নিজেদের ভাঁড়ারে খাবার সংগ্রহ করে রাখে যাতে বর্ষাকালে খাবারের অভাব না হয়। এখন তারা মানুষের চেয়েও সুখে শান্তিতে থাকে ; মানুষের চেয়েও ভালভাবে নিয়ম মত চলে। পিঁপড়েদের আকার অবশ্য ছোটই রয়ে গেছে, কিন্তু এখন তারা বেশ বুদ্ধিমান বলে তাদের সেজন্য কোন দুঃখ নেই। তারা জানে কোন প্রাণী তার আকার দিয়ে নয়, তার বুদ্ধি বিবেচনা ও সদগুণের বিচারে বড় হয়।

ঘাসের জামা

জাপান

জাপানের এক গ্রামের কাহিনী এটি। কতদিনের পুরান কথা সে খবর কেউ জানে না। তবু শত শত বছর ধরে কাহিনীটি চলে আসছে।

আসলে এ কাহিনী তখনকার দিনের যখন মানুষের শরীরের আকৃতি বা গঠন ঠিক মত গড়ে ওঠেনি। তখন কোন মানুষের মাথা প্রকান্ড কুমড়োর মত, আবার কারও বা আলুর চেয়েও ছোট মাথা। কোন মানুষ খুব লম্বা আবার কেউবা খুব বেঁটে।

সে ছিল বড়ই মূর্খ। তার নাম কারও জানা নেই। তবে গল্প বলতে সুবিধা হবে বলে তার একটি নাম রাখা হয়েছে—ওতোকি সান।

লোকটা ছিল মূর্খ আর তার ওপর খুবই দুষ্ট। খুব ঝগড়া করত অন্যদের সঙ্গে। রোজই এমন কিছু করত যাতে পাড়া প্রতিবেশীদের খুবই কষ্ট ও অসুবিধা হত। ওতোকি সান লোকদের জ্বালাতন করবার জন্য নিত্য নতুন উপায় বার করত। লোকে তার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত।

একবার সে তেঙ্গুর সঙ্গে মিলে নতুন ধরনের উপায় বার করল মানুষদের বিরক্ত করবার, তাদের ক্ষতি করবার।

তেঙ্গুকে অবশ্য কম লোকেই দেখেছে। তেঙ্গু এক অদ্ভুত ধরনের জীব। নাকটা তার ইয়া লম্বা আর তার পিঠে দুটো ডানা।

তার পরনের পোষাকও বিদঘুটে ধরনের। মাথায় কালো টুপি। আর সেই টুপিও ছিল যাদুর টুপি।

একদিন ওতোকি সান ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে বসে একটা লম্বা বাঁশের গাঁটগুলো পরিষ্কার করছিল। সেটা দিয়ে কি করবে তখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি। একবার ভাবল বাঁশের সঙ্গে ছোট ছোট পাথর বেঁধে খেলনা করবে। আবার ভাবল তাতে পাথর বেঁধে দূরে নিশানা করে ছুঁড়বে। কখনও বা ভাবছিল সেটা দিয়ে দূরবীন করবে।

ঠিক তখন ওতোকি সান দেখল, তেঙ্গু আসছে। তেঙ্গু এসে জিজ্ঞাসা করল—কি করছ?
ওতোকি সান বলল—দূরবীন তৈরি করছি।
—ও দিয়ে কি হবে?
—চাঁদ তারা দেখব দূরবীন দিয়ে।

তেঙ্গু জিজ্ঞাসা করল—সত্যি সত্যি কি কিছু দেখা যায় ও দিয়ে?

—নিশ্চয় দেখা যায়। ওঃ কি সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখা যাচ্ছে দূরবীনের মধ্যে দিয়ে। চাঁদের ওপর কত সুন্দর সুন্দর পাহাড়, রাস্তাঘাট কি চমৎকার। আর নদীরই বা কি শোভা। ঠিক যেন একটা রূপোলি রেখা—ওতোকি সান বলল।

শুনে তেঙ্গুর লোভ হল। বলল—ওটা আমাকে দাও।

—তোমাকে কেন দেব?

—ওটা যদি আমায় দাও তাহলে আমি তোমাকে আমার কাঠের জুতোটা আর কালো টুপি দেব তার বদলে। যদি চাও তো আমার এই ঘাসের তৈরি জামাটাও তোমাকে দেব।

ঘাসের জামাটা সত্যি বেশ দেখাচ্ছিল।

প্রথমে তো ওতোকি সান দূরবীনটা দিতে রাজীই ছিল না, একটু পরে সে রাজী হল। আর তার বদলে তেঙ্গুর সেই ঘাসের কোটটা নিল।

ওতোকি সান তারপরে ঘাসের জামাটা পরতে গেল। আশ্চর্য। জামাটা গায়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই

সে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন না দেখা গেল ঘাসের জামা, না দেখা গেল ওতোকি সানকে।

এবার ওতোকি সান হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল। কেউই তাকে দেখতে পাচ্ছে না বুঝে তার আনন্দ আর ধরে না।

সে পথের মানুষের জামা ধরে হেঁচকা টান মারে, কোন লোককে লাথি মারে, কারও বা চুল ধরে টানে। আর এইভাবে লোকদের জ্বালাতন করে সে খুব মজা পায়। দোকানে ফলের ঝুড়ি থাকলে এক লাথি মেরে সে ফলগুলো পথে ছড়িয়ে দেয়।



কত জিনিস যে সে এইভাবে তছনছ করল তার হিসাব নেই।

লোকে রেগে এদিক ওদিক তাকায়, কিন্তু কাউকে কোথাও দেখতে পায় না।

একটি ভারি সুন্দর কিমোনো পরে একটি মেয়ে বাড়ি চলেছে, ওতোকি সান তার টাকার থলিটা কেড়ে নেয়।

মাছের বাজারে টাটকা টাটকা মাছ জমা হয়েছে। লোকে দেখে একটা মস্তবড় মাছ হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

এইভাবে সারাদিন ধরে হাজার রকম কুকর্ম করে সন্ধ্যাবেলায় ওতোকি সান ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

তারপর বাড়ি ফিরে এসে নিজের গায়ের সেই ঘাসের জামাটা একটা খুঁটির উপর ঝুলিয়ে রেখে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। বিছানায় পড়তে না পড়তেই গভীর ঘুমে তার নাক ডাকতে লাগল।

একটু পরে তার মা ঘরে ঢুকল। ঢুকেই তার চোখে পড়ল সেই ঘাসের জামাটা, যেটা বাড়ি ফিরে ওতোকি সান খুঁটিতে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

খুঁটির ওপর কি একটা ঘাসের জামা ঝোলান দেখে তার মা একটু আশ্চর্য হল। না জানি কোথা থেকে ছেলে এটা তুলে এনেছে এই ভেবে ওতোকি সানের মা জামাটা খুঁটি থেকে নিয়ে উনোনের আগুনে ফেলে দিল। ঘাসের জামা নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল ওতোকি সানের। প্রথমেই সে খুঁটিটার দিকে দেখল, সেখানে জামা না দেখে তার তো মাথা গুলিয়ে গেল।

মাকে গিয়ে জামাটার কথা জিজ্ঞাসা করাতে মা বলল ঘাসের নোংরা ময়লা জামাটা সে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছে।

শুনে ওতোকি সানের চোখ কপালে উঠল।

রেগে আগুন হয়ে বলল— জামা পোড়ানো ছাইটা কোথায় গেল?

মা তাকে ইশারায় উনুনটা দেখিয়ে দিল।

ওতোকি সান উনুনের ছাইগুলো সমস্ত জমা করে তুলে রাখল। তার বিশ্বাস সেই জাদুর জামার পোড়া ছাইয়ের মধ্যেও নিশ্চয় কিছু তুকতাক থাকতে পারে।

তারপর ওতোকি সান সেই ছাই সারা গায়ে বেশ করে লাগিয়ে নিল ঘসে ঘসে। আর সেই ছাই মাখার সঙ্গে সঙ্গে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আগের দিনের মত সেদিনও সে হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল যেদিকে তার মন চায়।

এক জায়গায় কয়েকজন লোক নাচছিল। হঠাৎ একজনের মনে হল কে যেন তার হাত ধরে তার সঙ্গে নাচছে।

—কে নাচছে?

—কই, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।

আর এক জায়গায় গেল ওতোকি সান। সেখানে খুব ভীড় জমেছিল। সেটা ছিল গ্রামের এক বড় মদের দোকান। সেখানে বেশ দামী মদে ভর্তি একটা বড় পিপে ছিল। লোকেরা অবাক হয়ে দেখল পিপের নলের মুখটা আপনা থেকেই খুলে গেল, আর তা থেকে মদ গড়িয়ে মাটিতে পড়ছে। একটু পরে মদ গড়িয়ে পড়া বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ঢক ঢক করে মদ খাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরেই মদের পিপের নলটার মুখে দুটো হাত দেখা গেল, আর তারপর দেখা গেল দুটো পা।

তারপর মানুষের ঘাড়ের এক পাশ।

তারপর একটা চোখ।

চারিধারে লোকের ভীড় জমা হয়ে গেল। এদিকে ওতোকি সান গরমে ঘেমে উঠেছে। ঘামে ওতোকি সানের গায়ের ছাই ধুয়ে গেল।

আর তখনই লোকেরা তাকে দেখতে পেল—চেঁচিয়ে উঠল আরে এতো ওতোকি সান—ওতোকি সান।

তারপর লোকেরা তাকে ধরে আচ্ছা করে মার দিল—চোর, পাজী বলে গালাগাল দিতে লাগল।

এই সব শুনে গ্রামের মোড়ল তাকে ডেকে পাঠাল। ওতোকি সান এলে মোড়ল বলল—তোমার কি হয়েছিল ওতোকি সান?

—আমি তেঙ্গুর খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলাম।

লোকেরা শুনে হাসতে হাসতে বলল—তেঙ্গুর কাছে কিছু ভাল জিনিসও শিখতে পারতে ওতোকি সান।

ওতোকি সান কি আর করে, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

দূরে বসে বসে তেঙ্গু এই সব দেখছিল আর শুনছিল। সে মনে মনে খুব হাসল ওতোকি সানের অবস্থা দেখে।

শিকারী আর তার মায়াবী বাঁশী

জাম্বিয়া

অনেক অনেক দিনের পুরোনো গল্প।

জাম্বিয়ায় এক সাহসী শিকারী ছিল। তার নাম ছিল ওজো। সে যেমন সাহসী ছিল তেমনি ছিল তার শরীরে শক্তি। অন্যান্য যোদ্ধা শিকারী-দের মত ওজোও মাসের পর মাস ধরে শিকার করবার জন্যে জংগলে কাটাত।

শিকারের জন্যে জংগলে যখন যেত তখন সে জংগলের মধ্যে কাঠ খড় দিয়ে একটা কুটির তৈরি করে নিত। ভোর হবার সংগে সংগে শিকারে বেরিয়ে যেত আর সন্ধ্যার পর কুটিরে ফিরে আসত।

কুটিরে ফিরে তার প্রথম কাজ ছিল খাওয়া দাওয়া সেরে সারা দিনের শিকার করা পশুপাখির মাংস ভাল করে আগুনে সেঁকে রাখা, যাতে সেগুলি পচে না যায়।

এইভাবে কয়েক মাস পরে যখন অনেকটা মাংস জমা হত তখন ওজো গ্রামে ফিরে আসত।

ঘরে ফিরে সেই মাংসের বদলে গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে প্রতিদিনের দরকারী জিনিসপত্র আনত। আর এইভাবে তার পরিবারের লোকেদের ভরণ-পোষণ হত।

ওজোর ছিল তিনটে শিকারী কুকুর ; আর ছিল একটা বাঁশী। সেই বাঁশীটায় যাদু ছিল। ওজো বাঁশীটাকে সর্বদাই নিজের কাছে রাখত।

অন্য শিকারীরা গ্রামে ফিরে এসে ভূত প্রেতের অনেক গল্প শোনাত, কিন্তু ওজো কখনও কোন ভূতপেত্নী দেখেনি। লোকে গল্প করত জংগলে নাকি তারা বিরাট ইয়াবোম্বা রাক্ষসীকে দেখেছে! সেই ইয়াবোম্বা রাক্ষসীকে লোকে জংগলের মা বলত, কিন্তু ওজো কখনও এই জংগলের মা ইয়া-বোম্বাকে দেখেনি।

একবার ওজো একটা অচেনা জংগলে একাই শিকার করতে গেল। এবার সে তার তিনটে প্রভুভক্ত শিকারী কুকুর তার স্ত্রীর কাছে রেখে গেল। যাবার সময় বৌকে বলে গেল—কুকুরগুলো ঘরেই থাক। যদি কোন বিপদ ঘটে তাহলে আমি কুকুরদের ডেকে নেব।

এবার শিকারে এসে ওজোর অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল। তার কেমন যেন ভয় ভয় হত; কেমন যেন একটা বিপদের আশংকা তার মনের মধ্যে। আগে তার কখনও এমন হয়নি।

এ জংগলটা ছিল বিশাল। সম্ভবত এর আগে আর কোন শিকারী এ জংগলে শিকার করতে আসে নি। তাই শিকার করবার মত জানোয়ার ছিল অনেক।

একদিন রাতে সে শিকার করা পশু নিয়ে কুটিরে ফিরছে, হঠাৎ সে একটা বিকট রকমের চিৎকার শুনতে পেল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাকিয়ে সে দেখল সামনে বিশাল দানবের মত এক মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে।



ওজো ভয়ে কাঁপতে লাগল।

কাঁপতে কাঁপতে বলল—তুমি কি চাও?

—আমি জঙ্গলের মা ইয়াবোম্বা। যদি তুমি আমার কোন রকম ক্ষতি কর তাহলে আমি তোমায় মেরে ফেলব।

কথাগুলো বলে ইয়াবোম্বা সেখান থেকে অদৃশ্য হল।

শিকারী ওজোর মনে দারুন ভয় ঢুকল। কিন্তু তবু সে প্রতিদিনের মত কাজ করতে লাগল। রোজ যেমন খাওয়া দাওয়া করে মাংসগুলো সেঁকে তেমনিই সব কাজ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হতেই সে আবার শিকারে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যের পর সে যখন তার জঙ্গলের কুটিরে ফিরে এল, দেখল তার এত পরিশ্রমে শিকার করা সেঁকা মাংসগুলো উধাও হয়েছে।

ঘাসের ওপর খুব বড় বড় পায়ের দাগের মত দেখতে পেল ওজো। সে স্পষ্টই বুঝতে পারল এ সবই সেই রাক্ষসী ইয়াবোম্বার কাজ—আর কারও নয়।

এই রকম হতে লাগল রোজ। রোজই সে শিকার করে আনে তারপর মাংস সেঁকে রাখে আর পরদিন সন্ধ্যায় এসে দেখে সমস্ত মাংস ইয়াবোম্বা নিয়ে গেছে।

এইভাবে ওজোর দুমাস জঙ্গলে কাটল। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ওজো নিজের জিনিষপত্র বেঁধে ফেলল ঘরে ফিরে যাবার জন্যে। সে রাগে দুঃখে ইয়াবোম্বাকে খুব গালাগালি দিল—এত

মেহনত করে আমি মাংস জোগাড় করলাম আর রাক্ষসী ইয়াবোম্বা আমার সমস্ত মাংস চুরি করল, তার কখনও ভাল হবে না।

আর ঠিক সেই সময়ে আবার বিকট চিৎকার শোনা গেল ; দেখল সেই রাক্ষসী ইয়াবোম্বা দৌড়ে তার দিকে আসছে।

ওজো প্রাণ বাঁচাতে দৌড় লাগাল।

কিন্তু রাক্ষসীর সঙ্গে পারবে কেমন করে?

তবুও সে দৌড়ে গিয়ে একটা খুব বড় আর উঁচু গাছের ওপর চড়ে বসল। গাছটা এত উঁচু যে ইয়াবোম্বার পক্ষে সে গাছে চড়া সম্ভব নয়। ইয়াবোম্বা রাগে জ্বলছিল। তার ওপর ওজোকে গাছের ওপর চড়ে যেতে দেখে তার নাগাল না পেয়ে রেগে দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে গাছটাকে কাটতে লাগল।

এখন সে কি করবে? রাক্ষসীর হাত থেকে আর বুঝি নিস্তার নেই।

ঠিক সেই সময়ে তার মনে পড়ল তার সেই যাদু বাঁশীর কথা। চট করে কোমরে বাঁধা বাঁশীটা বের করে ওজো তাতে ফুঁ দিল। সেই বাঁশীর সুর তখনই পৌঁছে গেল তার কুকুরদের কানে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরের উঠোনে বাঁধা তিনটে কুকুর এক টানে দড়ি ছিঁড়ে জঙ্গলের দিকে দৌড়তে লাগল। নিমেষের মধ্যে তিনটে কুকুর সেই গাছটার নীচে হাজির হল। গাছের ওপর বসা ওজোকে তারা দেখল।

তাদের দেখে ওজোর ধড়ে যেন প্রাণ এল। সে কুকুরদের ইশারা করল ইয়াবোম্বাকে আক্রমণ করতে। আর হুকুম পেয়ে কুকুরগুলো নিমেষের মধ্যে এক সঙ্গে ইয়াবোম্বাকে আক্রমণ করল।

দেখতে দেখতে তারা রাক্ষসীর সর্বাঙ্গ ছিঁড়ে রক্তাক্ত করে দিল আর যন্ত্রণায় রাক্ষসী ইয়াবোম্বার প্রাণ বের হয়ে গেল।

রাক্ষসী মরার পর ওজো গাছ থেকে নেমে এল। তারপর ওজো কুকুর তিনটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরছে, এমন সময় দেখল তার সামনে খুব সুন্দরী একটি মেয়ে।

মেয়েটি বলল—আমি ইয়াবোম্বার কারাগারে বহু বছর ধরে বন্দী হয়ে ছিলাম। আজ তুমি রাক্ষসীকে মেরে আমায় উদ্ধার করেছ। এতদিনে আমি মুক্ত হলাম। আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।

ওজো তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে তাকে সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে এল।

তারপর একদিন রাতে ওজোর মনে হল কেউ যেন তাকে অস্ত্র দিয়ে মারতে আসছে।

ওজো তার হাতটা চেপে ধরে ফেলল।

তারপর আলো জ্বেলে দেখল অন্য কেউ নয়, তার দ্বিতীয় স্ত্রী।

ওজো আশ্চর্য হয়ে বলল—এ তুমি কি করছিলে?

সে বলল—আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই।

—কেন

—তুমি ইয়াবোম্বাকে মেরেছ। আমি তার কারাগারে বন্দী ছিলাম না। আমি তোমায় মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আমি ইয়াবোম্বার ছোট বোন। দিদিকে হত্যা করার প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমি সুন্দরীর বেশ ধারণ করেছিলাম।

ওজো চট করে নিজের মায়া বাঁশী বের করে বাজাল। বাঁশী বাজতে না বাজতে সেই তিনটে দুর্দান্ত কুকুর এসে রাক্ষসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর নিমেষের মধ্যে তাকে মেরে ফেলল।

তারপর ওজো তার আগের বৌ, তিনটে প্রভুভক্ত কুকুর আর তার মায়াবী বাঁশী নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল। এরপর আর একটা বিয়ে করবার ইচ্ছা তার কখনও হয়নি।

কথা বলা ডিম

আমেরিকা

এক বিধবার দুই মেয়ে ছিল। রোজি আর ব্লেণ্ডি। রোজি ছিল ভারি ঝগড়াটি। সে কোনো কাজ করত না। আর ব্লেণ্ডি ছিল ঠিক তার বোনের উল্টোটি। সে ছিল যেমন ভাল তেমনি পরিশ্রমী। সারা দিনই কিছু না কিছু কাজ নিয়ে থাকত।

কিন্তু তাদের মা সর্বদা রোজির পক্ষ নিত। রোজিকে সে বেশী ভালবাসত তাই তাকে দিয়ে কোন কাজই করাত না। ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, গরুবাছুরের সেবা যত্ন করা এই সব কাজেরই ভার ছিল ব্লেণ্ডির ওপর।

একদিন ব্লেণ্ডি জল ভরতে কূয়োর ধারে গেছে। সেখানে এক বুড়ি বসে ছিল।

বুড়ি করুণভাবে বলল—লক্ষ্মী মেয়ে, আমায় একটু জল খেতে দেবে? তেষ্টায় আমার প্রাণ যায়।

—নিশ্চয়ই বুড়ি মা—এই বলে খুব আদর করে ব্লেণ্ডি তাকে জল খেতে দিল।

ঠান্ডা জল খেয়ে বুড়ির প্রাণটা যেন বাঁচল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন ব্লেণ্ডির মা ব্লেণ্ডির উপর কোন কারণে খুব রাগ করল। তাকে মারধোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিল।

বেচারী ব্লেণ্ডি আর যায় কোথায়?

তার ঘরে ফেরবার সাহস নেই। ঘরের বাইরেও তার কোন আশ্রয় নেই। কি করবে ব্লেণ্ডি ভেবেই পেল না। অবশেষে সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল জঙ্গলের দিকে। এমন ঘরের চেয়ে জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারের হাতে প্রাণ দেওয়াই শ্রেয়—এই ভাবল ব্লেণ্ডি। ঘরেই বেশী ভয় তার।

পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল। এমন সময় সে দেখে তার সামনে এক বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ব্লেণ্ডি দেখল এ সেই বুড়ি যাকে সেদিন সে জল খেতে দিয়েছিল।

বুড়ি জিজ্ঞাসা করল—তুমি কাঁদছ কেন বাছা?

—আমার মা আমায় মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—কেন মেরেছে তোমার মা?

—মা আমায় দেখতে পারে না।

—আচ্ছা, তুমি কোন চিন্তা কর না। চল আমার সঙ্গে।

ব্লেণ্ডি বুড়ির পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

—আমার সঙ্গে এস, কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে তোমায়।

কি কথা বুড়ি মা? ব্লেণ্ডি তাকে জিজ্ঞাসা করল।

কথাটা এই যে আমার কোন কাজ দেখে তুমি হাসবে না।

ব্লেণ্ডি বুড়ির কথা শুনে মাথা হেলিয়ে হাঁ বলল। খানিকটা পথ হাঁটবার পর ব্লেণ্ডি আশ্চর্য হয়ে দেখল দুটো কুড়ুল হাওয়ায় লড়ছে নিজেদের মধ্যে।

আবার একটু যাবার পর দেখল—হাওয়ায় দুখানা হাত। তার দুটো নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে।

তারপর লড়তে দেখল কেবল দুটো পাকে, তারপর কেবল দুটো মাথা।

বুড়ি বলল—ব্লেণ্ডি, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। এই বলে সামনেই একটা কুটিরের দরজা দিয়ে বুড়ি কুটিরের মধ্যে ঢুকল।

—বাছা, কিছু রান্না কর। সকাল থেকে আমি কিছু খাইনি। তোমারও খিদে পেয়ে থাকবে।

ব্লেণ্ডিকে রান্না করতে বলে বুড়ি এক ভাঙ্গা চেয়ারে বসল। তারপর দুহাত দিয়ে নিজের মাথাটা খুলে নিয়ে দু হাঁটুর ওপর রাখল, যেমন করে লোকে টুপি খুলে রাখে। বুড়ির মাথা কাটা ধড়টা দেখে ব্লেণ্ডি বড়ই আশ্চর্য হল, কিন্তু সে একটি কথাও বলল না।



একটু পরে বুড়ি আবার নিজের মাথাটা হাঁটুর উপর থেকে তুলে নিয়ে যথাস্থানে বসিয়ে দিল। এবার তার শরীরটা স্বাভাবিক দেখাতে লাগল।

তারপর বুড়ি একটা হাড় নিয়ে ব্লেণ্ডিকে দিয়ে বলল—নাও এটা একটা ডেকচিতে রেখে রান্না কর।

ব্লেণ্ডি হাড়টা এক ডেকচিতে রেখে উনোনে চড়াল। আর দেখতে দেখতে ডেকচিটা মাংসে ভর্তি হয়ে গেল।

—হাঁ, এবার ভাত রাঁধতে হবে। —এই বলে বুড়ি কেবল এক দানা চাল ব্লেণ্ডির হাতে দিল।

ব্লেণ্ডি সেটা ডেকচি করে উনুনে রাখতেই ডেকচি ভাতে ভরে গেল।

তারপর দুজনে পেট ভরে খেয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে বুড়ি ব্লেণ্ডিকে বলল—তুমি সত্যি বড় লক্ষ্মী মেয়ে। এবার তুমি নিজের বাড়ি ফিরতে পার। তোমায় আমি এমন কিছু ডিম দেব যারা কথা বলতে পারে।

ব্লেণ্ডি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—ঐ দিকে যাও, ওখানে মুরগীদের ঘর। সেখানে কিছু ডিম দেখতে পাবে। যে ডিমগুলো তোমায় বলবে "আমায় নিয়ে চল", কেবল সেই ডিমগুলি তুমি তুলে নেবে। যে ডিমগুলো বলবে "আমাকে নিও না" সে ডিমগুলো তুমি নেবে না। তারপর বাড়ি যাবার সময় ডিমগুলো পথে ফেলে দেবে যাতে সেগুলি ভেঙেগ যায়।

ব্লেণ্ডি মুরগীর ঘরে গেল।

যে ডিমগুলি বলল "আমাদের নাও" ব্লেণ্ডি সেই ডিমগুলো একটা ঝুড়িতে তুলে নিল, তারপর নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল।

যেতে যেতে বুড়ির আদেশ মত ডিমগুলো পথের ওপর ফেলে ভেঙেগ দিল।

সঙেগ সঙেগ ব্লেণ্ডি অবাক হয়ে দেখল সেই ডিমগুলো থেকে বেরোলো হীরে মুক্তো, সুন্দর সুন্দর রেশমী কাপড় আর নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর গয়না।

ব্লেণ্ডি সেগুলো তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

তার মা সেই সুন্দর দামী জিনিষগুলো পেয়ে খুব খুশী হয়ে এবার ব্লেণ্ডিকে খুব আদর করল।

তারপর তার মা রোজিকে বলল—তুই এবার জঙগলে যা, আর এই রকম দামী দামী জিনিষ নিয়ে আয়।

রোজিও জঙগলে গেল। ব্লেণ্ডির মত সেও সেই বুড়িকে দেখতে পেল। সে মিথ্যা করে বুড়িকে বলল বাড়িতে তার খুব কষ্ট, তাই সে বুড়ির সাহায্য চায়।

বুড়ি বলল--বেশ কথা, আমার সঙেগ চল। কিন্তু এখানে তুমি যা কিছু দেখবে তা দেখে হাসবে না।

রোজি মাথা হেলিয়ে বলল আচ্ছা।

কিন্তু রোজির স্বভাব ব্লেণ্ডির মত নয়, সে ছিল অন্য প্রকৃতির মেয়ে।

একটু পরেই বুড়ির ঐ সব অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখে সে বুড়িকে ঠাট্টা করে হাসতে লাগল।

সকাল হলে বুড়ি তাকেও বলল—এবার তুমি বাড়ি যেতে পার। আমি তোমায় কিছু ডিম উপহার দেব। ডিমগুলো কথা বলতে পারে। যে ডিমগুলো বলবে 'আমাদের নাও' সেইগুলো নিও। যেগুলো বলবে 'আমাদের নিও না' সেগুলিকে তুমি নেবে না।

রোজির স্বভাবই এই, সে বেছে বেছে সেই ডিমগুলোই নিল যেগুলি বলেছিল 'আমাদের নিও না'।

পথে এসে রোজি ডিমগুলি ফেলে ভাঙগল।

কিন্তু তার সেই ভাঙগা ডিমগুলি থেকে বার হল সাপ, বিছে আর নানা রকম বিষাক্ত পোকা।

তাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে রোজি সেখান থেকে দৌড়ে বাড়ি এল।

সে যখন হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি পেঁছাল তখন সেই সাপ, বিছে, বিষাক্ত পোকাগুলোও তার পেছনে তাড়া করে সেখানে এল।

মা তো রেগে আগুন। রাগের চোটে মা এবার রোজিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

এক যে ছিল বাঘ

ভারত

এক সময় ভীমক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি খুব সুখে রাজত্ব করতেন। রাজার মন ছিল সদাই প্রসন্ন। তিনি ছিলেন যেমন ধার্মিক তেমনি সদাচারী। রাজার ছিল অনেক গ্রাম আর অনেক গরু বাছুর।

সেকালে গরু বা বাছুরই মানুষের সম্পত্তি বলে গণ্য হত। যার যত বেশী গরু বলদ সে তত বেশী ধনী ছিল।

সেই ভীমক রাজার দেশে এক গরীব চাষীও ছিল। সেই চাষীর সম্পত্তি বলতে ছিল কেবল একটি গরু। লোকটি ছিল সাদাসিধে ভাল মানুষ আর তার গরুটিও ছিল বড় শান্তশিষ্ট। ভোর হলে সে একাই মাঠে চরতে যেত। আর সন্ধ্যাবেলা নিজেই ঘরে ফিরে আসত। গরুর একটি ছোট বাছুরও ছিল। রোজ সন্ধ্যাবেলা বাছুরটি দড়িতে বাঁধা অবস্থায় গলা বাড়িয়ে পথ চেয়ে থাকত—কখন তার মা ফিরবে সেই আশায়।

চাষীর গরুটি ছিল কামধেনুর মত সুলক্ষণা। শিং দুটি যেন ছাঁচে ঢেলে তৈরি, সুডৌল। গায়ের রং ছিল দুধের মত সাদা। চোখ দুটো কাজল কালো, পায়ের খুরগুলো চকচকে কালো আর মজবুত, দেখলে মনে হত যেন কারিগরের হাতে গড়া। এই সুন্দর গরুটির জন্যে চাষীর মনে আনন্দের আর অন্ত ছিল না। এমন একটি গরু তার আছে তাই সে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করত।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রতিদিনের মত গরুটি যখন জঙ্গলে চরে ঘরে ফিরছিল তখন সে রাস্তা হারিয়ে ফেলল। পথ হারিয়ে অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরল কিন্তু কিছুতেই পথ খুঁজে পেল না। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত গভীর হল, চারিদিকে ঘন অন্ধকার। এ অবস্থায় বেচারা কি করে, কোথায় যায়? সে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল; ভাবতে লাগল তার বাছুরটির কথা। বেচারা না খেতে পেয়ে কতই না কষ্ট পাচ্ছে! না জানি কত হাম্বা হাম্বা করে মাকে ডেকে ডেকে সারা হল। ...তা ছাড়া জঙ্গলে কত রকম হিংস্র জানোয়ার। কেউ যদি তাকে খেয়ে ফেলে... এই সব দুশ্চিন্তায় গরুটি ব্যাকুল হয়ে উঠল।

রাতের সেই গভীর অন্ধকারে হঠাৎ ঘন জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুধার্ত বাঘের গর্জন শোনা গেল। বাঘের গর্জনে বনের গাছপালা, পশুপাখি সব যেন ভয়ে কাঁপতে লাগল। ভয়ে কান খাড়া হয়ে গেল গরুটার। সে লেজ তুলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দৌড়তে লাগল।

ইতিমধ্যে বাঘটা দুই লাফে গরুর সামনে পৌঁছে গেল। লম্বা লাল টকটকে জিভ দিয়ে নিজের ল্যাজটা চেটে গর্জন করে বাঘ বলল—দাঁড়া, পালাচ্ছিস কোথায়? আমার কবল থেকে পালাবি তোর এত সাহস? জানিস না আমি কে? বাঘটার কাঁচের মত চকচকে গোল বড় দুই চোখ যেন ঘুরছে।

ভয়ে গরুর গায়ের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠল।

ভেরার বাচ্চার মত মিনমিনে কাঁপা গলায় গরু বলল—আমি জানি তুমি জঙ্গলের রাজা, তোমার গায়ে দারুন জোর আর খুব সাহস তোমার। কিন্তু...

বাঘ জোর গলায় জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু? কিন্তু কি?

—এই যে, তুমি তো আমায় মেরে খেয়ে ফেলবে কিন্তু...

—আবার কিন্তু...কিন্তু কি? বাঘের তর সয় না, খিদেয় তার পেট জ্বলছে। সে বলল—যা বলতে

চাস, চটপট বল্। জানিস না আমি কতদিন ধরে উপোস করে আছি? বল কি বলবি। বাঘটা অধৈর্য হয়ে মাটিতে থাবা ঘষতে ঘষতে একদৃষ্টে গরুর দিকে চেয়ে রইল।

বেচারী দুর্বল গরু আরো ভয় পেয়ে গেল। শত চেষ্টাতেও যেন তার গলা থেকে স্বর বের হয় না। অনেক চেষ্টায় কাঁপতে কাঁপতে বলল—হে বনরাজ, আমি মরতে ভয় পাই না, যখন তোমার ইচ্ছা আমায় খেয়ো। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে...আমার একটি ছোট্ট বাছুর আছে, বড্ড ছোট এখনও। সে কেবল আমার দুধ খেয়েই বেঁচে থাকে। কেবল একটিবার, একটিবার শুধু আমায় তার কাছে যেতে দাও। কেবল একবার আমি তাকে প্রাণভরে আদর করে নিতে চাই, তাকে শুধু একবার পেটভরে দুধ দিতে চাই। তারপর আমায় তুমি মেরে খেয়ো, আমার একটুও কষ্ট থাকবে না।

বাঘ বিকট জোরে হেসে উঠল। বলল, বড় ভালো মানুষ সাজছিস। তোর ঘাস খাওয়া বুদ্ধি, তুই সেই বুদ্ধির জোরে পার পাবি ভেবেছিস?...হুঁ ঘরে ফিরতে চাস...তাই না?

—হাঁ মহারাজ, আমি ঘরে গিয়ে তাকে খাইয়ে বুঝিয়ে বলে আবার সোজা ফিরে আসব এইখানে।

বাঘ আবার খুব হাসল—এমন কথা কি কেউ কখনও শুনেছে? তুই ঘরে গিয়ে আবার বাঘের মুখে ফিরে আসবি; এসে বলবি 'ওগো উপবাসী বাঘ এবার তুমি আমায় খাও'। আমি কি এতই বোকা? তোর এ চালাকি আমার কাছে চলবে না।

—না না, এমন কথা বল না। আমি তোমায় মিথ্যা কথা বলিনি। আমি তোমায় ঠকাবার চেষ্টা করছি না। আমি ভগবানের নামে দিব্যি দিয়ে বলছি আমি ফিরে আসব।

বাঘ চুপ করে গরুর কথাগুলি শুনছে। গরু আবার বলল—আমার এত করে বলাতেও তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না? তাহলে এবার আমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় বাছুরের দিব্যি দিয়ে বলছি আমি ফিরে আসব। আমার সততার এর চেয়ে বড় আর কি প্রমাণ দেব? বনরাজ, তুমি দয়া করে আমার প্রার্থনা মেনে নাও। গরুর দু চোখে জল।

গরুর চোখের জল পড়তে দেখে হিংস্র বাঘের অতি কঠিন প্রাণও যেন একটু গলে গেল। সে এক ধমক দিয়ে বলল—ঠিক আছে, তবে তুই চটপট ঘরে যা, আর তোর বাছুরকে দুধ দিয়েই এখানে চলে আসবি মনে থাকে যেন। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

দুঃখী গরু ঘরে ফিরে এল। এসে দেখল খিদের জ্বালায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তার বাছুরটি খুঁটির কাছে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মায়ের পায়ের শব্দ শুনে বাছুরটা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ল। তারপর সামনের পা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল—মা আজ এত দেরী করে ফিরলে কেন? দেখ তো খিদেয় তেষ্টায় আমার কি দশা হয়েছে। আমার চোখ যেন বেরিয়ে আসছে মা, পেটের নাড়ি ভুঁড়ি মোচড় দিয়ে উঠছে খিদের জ্বালায়। কাল থেকে আর এত দেরী কোর না মা, এত খিদে আমার সয়না মা।

গরুটি একটি কথাও বলতে পারল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, আর তার দু চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

মাকে এমন ভাবে কাঁদতে দেখে বাছুর জিজ্ঞাসা করল—কাঁদছ কেন মা? কাঁদতে কাঁদতে রুদ্ধ স্বরে মা বলল—বাছা, আজ আমি তোকে শেষ বারের মত দুধ খাওয়াতে এসেছি। একটু পরেই আমায় যেতে হবে, বাঘ আমায় খাবে। কাল থেকে আর কোনদিনই তোকে আমি দুধ খাওয়াতে পারব না। ভাল থাকিস। প্রভুর কথা শুনিস। শুকনো এঁটো বাসি যা দেবেন তাই খেয়ে নিবি খুশী মনে। দুধের জন্যে জেদ করিস না, দুধের বদলে একটু ফ্যান পেলেও ভাগ্য বলে মনে করিস।

বাছুরের মনে বড় কষ্ট হল। তার মায়ের কথা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। অধীর হয়ে তাই বলল—মা, বাঘ তোমায় খাবে কেন, তুমি তার কি ক্ষতি করেছ?

বাছুরের কথার কিইবা উত্তর দেবে, তাই মা চুপ করে রইল। বাছুর দুধের বাঁট ছেড়ে দিল, তারপর রাগ করে বলল—তুমি না থাকলে কাল থেকে কে আমায় দুধ দেবে?—কেউই আর তোকে দুধ দেবে না বাছা......এর বেশী আর গরু কিছুই বলতে পারল না। জল ভরা চোখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বাছুরকে শেষ বারের মত আদর করে গা চেটে কাঁদতে কাঁদতে গরু তাড়াতাড়ি করে

জঙ্গলের দিকে যেতে লাগল যেখানে বাঘ তাকে খাবার আশায় বসে আছে।

বাছুরের জন্য গরুর খুবই মনের কষ্ট। সে আর কোন দিকে তাকাল না। হঠাৎ শুকনো পাতার উপর পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখল তার বাছুর। সে দড়ি ছিঁড়ে দৌড়ে দৌড়ে মায়ের পেছনে পেছনে আসছে।

গরু ব্যাকুল হয়ে বলল—বাছা, তুই কেন আমার সঙ্গে আসছিস, তুই ঘরে ফিরে যা।

—আমি একা কেমন করে থাকব মা, তুমিই বল। তার চেয়ে তুমি বাঘকে বল সে যেন আমাকেও খেয়ে ফেলে। তাহলে আর আমাদের কোন দুঃখ থাকে না। তোমার মরতে কষ্ট হবে না, আর আমারও মা হারিয়ে বেঁচে থাকার কষ্ট হবে না। তাই সবচেয়ে ভাল হবে।

বাছুরের মুখে এ কথা শুনে দুঃখে গরুর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

আর তক্ষুনি বাঘের সেই ভয়ঙ্কর চোখ দুটো দেখা গেল। ক্ষুধার্ত বাঘটা গর্জন করতে করতে হাজির হয়েছে সেখানে।—আচ্ছা, তাহলে তুই এসেছিস, বাঘ তার গোঁফে তা দিয়ে বলল।

গরু আর বাছুর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—বেশ তাহলে এবার তোকে খেতে আরম্ভ করি... বাঘের জিভ দিয়ে লালা ঝরতে লাগল। বাঘের ল্যাজটা নড়ছে।



গরু আগের মতই মাথা নীচু করে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাঘ গরুর উপর লাফ দিতে যাচ্ছে এমন সময় বাছুরটা চেঁচিয়ে উঠল—দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার মাকে খেয়ো না, তুমি আমাকে আগে খাও। নিজের চোখে মার হত্যা আমি কিভাবে সইব?

বাঘ কিছু বলার আগেই গরু বলে উঠল—না না, ওর কথায় কান দিও না। ও বড় অবুঝ আর জেদি।

বাছুর লেজ তুলে লাফিয়ে উঠে বলল—না, তা হবে না। তুমি আমার মাকে ছেড়ে দাও। আর যদি তাকে খাবেই, তবে প্রথমে আমায় খাও তারপরে মাকে খেয়ো।

বাঘের মুখটা কেমন যেন অদ্ভুত দেখাল—বলল—চুপ, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! যা ওদিকে গিয়ে বোস।

বাছুর দৌড়ে এসে বাঘের মুখের কাছে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বলল—না না, তুমি আমাকেই প্রথমে খাও।

বাঘ তার উপর যেমনি থাবা তুলেছে তেমনি গরু চেঁচিয়ে উঠল—বনরাজ, এমন নিষ্ঠুর হয়ো না। তুমি আমাকে আগে খাও তারপর যা ইচ্ছা হয় তাই কোরো।

এই বলে গরু শিং দিয়ে বাছুরটাকে সরিয়ে দিল, আর নিজের মাথাটা বাঘের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্ষুধার্ত বাঘ কেমন যেন থমকে দাঁড়াল। কি করবে ঠিক করতে পারল না। তারপর সে সামনে তাকাল। দেখল দুটি অসহায় নিরীহ প্রাণী তার সামনে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেই মাথা ঝুঁকিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করে রয়েছে। একদিকে বাছুর আর এক দিকে তার মা; দুজনের চোখ দিয়েই জল পড়ছে।

--নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নাও আমি কাকে আগে খাব, বাঘ বলল।

গরু বলল—আমরা আর কি বলব, তোমার যাকে ইচ্ছা।

বাঘ গর্জন করে বলল—যা ঠিক মনে কর তাড়াতাড়ি বল। —আমাদের জায়গায় যদি তুমি হতে তাহলে তুমি কি করতে এই ভেবে তুমি নিজেই যা ইচ্ছা কর। এখানে আর কি বা বলার আছে? বলতে বলতে গরু জোরে কেঁদে ফেলল।

বাঘের আর এ দৃশ্য সহ্য হল না। হঠাৎ তার পাথরের প্রাণ কেমন করে উঠল। সে সামনের থাবা দিয়ে গরু আর বাছুরের পিঠে আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিল, তারপর বলল—যাও ঘরে ফিরে যাও তোমরা। আমি তোমাদের কাউকেই খাব না। তোমাদের খাবার আমার আর ইচ্ছা নেই। দেখছি যদি অন্য কিছু শিকার পাই তাই খেয়ে খিদে মেটাব।

এই বলে বনরাজ সেখান থেকে রাজার মত চলে গেল।

GMGIP (Pub. Unit), Sant.—S 14—3 MIB/83—8-3-86—2000.

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

